Uppanaok

A novel by Imdadul Haque Milon
Price Bdtk 60.00 only
US $ 2.00
Cover Design : Dhruba Eash

A SHIKOR Publication
ISBN 984-760-082-1

উপন্যাস ইমদাদুল হক মিলন

B
MILA

উপনায়ক

ইমদাদুল হক মিলন

pathfinder

প্রথম শিকড় সংস্করণ : একুশে বইমেলা ২০০৫
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৩

স্বত্ব : নির্বাচিতা হক
শুভেচ্ছা হক

প্রকাশক : এম আর মিলন
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

শিকড় ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০ থেকে
এম আর মিলন কর্তৃক প্রকাশিত
হেরা প্রিন্টার্স ২৭ শ্রীশদাস লেন
থেকে মুদ্রিত অক্ষর বিন্যাসে
শিকড় কম্পিউটার্স
ফোন ৭১১৬০৫৪

দাম ৬০ টাকা

ISBN 984 760 082 1

উৎসর্গ

ইমদাদুল হক মিলন
প্রায়ই নিভৃতে যার মুখোমুখি হই

আমি

স্কুটারওলা বলল, আট টেকা দেন।

শুনে আমার গাটা জ্বলে যায়। নিউমার্কেট থেকে সদরঘাট আট টাকা। আমি দুপকেটে দুহাত পুরে লোকটার দিকে ভাল করে তাকাই। লোকটা আরেক দিকে তাকিয়ে আছে। আয়েশ করে পান চিবুচ্ছে। পরে আছে গোলাপী রঙের ফুলহাতা শার্ট। বগলের কাছ অব্দি গোটানো। নিম্নাঙ্গে সবুজ লুঙ্গি। কালো মোষের মতন মুখে পশ্চিমা দারোয়ানদের মতো মোটা গোঁফ। এ ধরনের লোকগুলোর ওপর আমার একটা অযথা রাগ আছে। এটা আমার একটা দোষ। কিছু কিছু লোকের নাম শুনেও। যেমন কুদ্দুস।

একবার খুব ছেলেবেলায়, আমাদের এক বন্ধু অনু, গেণ্ডারিয়াতে ওদের বিরাট বাড়ি ছিল। অনেককালের পুরনো একটা একতলায় ওরা থাকত। সামনে খোলা উঠোন। চারদিকে ফুল ফলের গাছ। অনেক নারকেল গাছ ছিল বাড়িটায়, অনেক পেয়ারা গাছ ছিল। অনুর সঙ্গে আমি এক স্কুলে পড়ি। বিকেলবেলা ওদের বাড়ি যেতাম বেডমিন্টন খেলতে। অনেক ভাড়াটে ছিল বাড়িটায়। একবার এক ভাড়াটের ছেলের সঙ্গে অনুর ঝগড়া হয়। স্কুল বন্ধ। বিকেলবেলা আমরা গেছি বেডমিন্টন খেলতে, অনু বলল, আমাকে মারতে চেয়েছে। শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চলত দেখি।

ভাড়াটেদের একটা ছেলে ছিল আমাদের বয়সী।

কালো কুচকুচে দেখতে। ছেলেটার সঙ্গে আমি কখনও কথা বলিনি। কিন্তু ওর দিকে তাকালেই ভেতরে ভেতরে রেগে যেতাম।

সেই ছেলেটা উঠোনের এককোণে দাঁড়িয়ে। কেন যে আমার মনে হল

এই ছেলেটাই অনুকে মারতে চেয়েছে। কোনও কথা না বলে ছেলেটার কলার চেপে ধরেছিলাম। শালা...

ছেলেটা থতমত খেয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে ছুটে আসে অনু।

করছিস কী! ও না তো!

খুব লজ্জা পেয়েছিলাম।

গল্পটা মনে পড়তেই স্কুটারঅলাকে বলি, নিউমার্কেট থেকে সদরঘাট আট টাকা! বল কি?

ঠিকই কইছি!

দেখি, তোমার মিটার দেখি।

লোকটা ঘাড় ত্যাড়া করে বলল, মিটার নাই। ভাড়া আট টেকাই। ততক্ষণে আমার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। লোকটার কথা বলার ধরনে গা কামড়ে ধরেছে। বললাম, পাঁচ টাকার এক পয়সা বেশি দেব না।

কম অইবো না, আট টেকাই দিতে অইবো।

যদি না দিই!

দিয়া ভাল কইবেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার ভেতর লাফিয়ে ওঠে রক্ত। গা চিড়বিড় করে ওঠে। কোনও কথা না বলে কলার ধরে লোকটাকে টেনে বের করি। তারপর বাঁ হাতে ঠিক মুখের ওপরে একটা ঘুষি। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার। দু মিনিটে চারপাশে লোকজন জমে যায়। ট্রাফিক আইল্যান্ড থেকে ছুটে আসে একজন ট্রাফিক। আমি কেয়ার করি না।

মার খেয়ে লোকটার তখন নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। গোলাপী জামায় ছোপ-ছোপ রক্ত। দেখে আমার রাগটা কমে। পকেট থেকে দুটো দশ টাকার নোট বের করে ছুঁড়ে ফেলি মাটিতে। তারপর লোকটার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বলি, নে শুয়ারের বাচ্চা। তারপর দুহাতে কলার ঝাড়া দিয়ে ভিড় ঠেলে চলে আসি। পাবলিক কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায় না। আমার পরনে ছিল নীল জিনসের প্যান্ট, শার্ট। প্যান্টের হাঁটুর কাছে স্টিকার লাগানো। তাতে লেখা 'লাভ'। বুকের কাছে দুটো বোতাম খোলা। গলায় সোনার চেন। হাতে ঘড়ি নেই। মোটা স্টিলের একটা শিকল পরা। লোকে ভাবে, শালা মহা রংবাজ। কথা বলতে সাহস পায় না।

আমি তারপর গোবিন্দপালের দোকানে যাই। বাংলাবাজারের মোড়ে

গোবিন্দপালের চায়ের দোকানে বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা। সন্ধের পরই আড্ডাটা জমে। চা সিগারেট খাওয়া আর গল্প করা। আগে নিয়মিত বসতাম ওখানে। আজকাল যাওয়া হয় না। আমার এ রকম হয়। এক জায়গায় বেশিদিন যেতে ইচ্ছে করে না। বোরিং লাগে। রোজই এক রকমের কথা টথা। একই গল্প ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রোজ বলা। একই তালে হাসা, কথা বলা। চা খাওয়া, সিগারেট খাওয়া। আর একই চেহারার মানুষজন দেখা। এজন্যে আমি আজকাল অন্যদিকে থাকি। আড্ডার জায়গা চেঞ্জ করেছি। এখন রোজ সন্ধেবেলা শাহবাগ যাই। সেখানে আমার বন্ধু রাগিবের ছোট্ট দোকান। সাইন বোর্ড লেখা, রাবার স্ট্যাম্প বানানো এসবের কাজ করে রাগিব। সন্ধেবেলা রাগিবের দোকানে আড্ডা ছাড়া অন্য কাজ হয় না।

রাগিবের দোকানের আড্ডা বেশ মজার। কিছু তরুণ কবি, দু একজন আর্টিস্ট, গিটার বাজিয়ে পপ গান গায় এমন একজন, তসলিম, আড্ডাটা ভাল লাগে। জানি কিছুকাল পর আর লাগবে না। যতদিন লাগে চালিয়ে যাচ্ছি।

আজ রাগিবের দোকানে যাওয়া হয়নি। দুপুরের পর থেকে মন খারাপ ছিল।

দুপুরবেলা অফিসে বসে আছি, আমি আর সিরাজ। দুদিন আগে সিরাজ চিটাগাং থেকে এসেছে। বছর চারেক হল সিরাজ চিটাগাং-এ। ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি করে ওয়াপদায়। দুতিন মাসে একবার ঢাকায় আসে। সিরাজ যে কদিন ঢাকায় থাকে, আমার সময়টা ভাল কাটে।

আজও দুপুর বারটা থেকে ভাল ছিলাম। হঠাৎ দুটোর দিকে সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। আমি আর সিরাজ বসে চা খাচ্ছি, নদী এল। শাদা শালোয়ার আর সমুদ্রনীল বুটিদার কামিজ পরা। হাতে বইখাতা। নদীকে দেখেই আমি বুঝতে পারি ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছে। মুখটা শুকনো। নদীর এখনও কিছু খাওয়া হয়নি।

খানিক আগে আমি আর সিরাজ একটা স্নাকবার থেকে পেস্টি আর কোক খেয়ে এসেছি। এখন মুখোমুখি বসে সিগারেট খাচ্ছি। আমার পকেট দুদিন ধরে ভাল। হাজার দেড়েক টাকা পেয়েছি। যেদিন টাকাটা পেয়েছি সেদিনই ছুটে গিয়েছি নদীর কাছে। নদীর সঙ্গে এ রকম হঠাৎ হঠাৎ আমার দেখা হয়। নদীর কথা মনে পড়লেই আমি ছুটে যাই ইউনিভার্সিটিতে। সেমিনার থেকে, পাবলিক লাইব্রেরির বারান্দা থেকে কিংবা টিএসসি থেকে নদীকে খুঁজে নিই। নদীর কি আমার কথা কখনও মনে পড়ে? হয়ত পড়ে। কিংবা পড়ে না।

নদীর তো অনেক চেনা মানুষ, অনেক বন্ধু। এত ভিড় কাটিয়ে আমার কথা কি নদীর মনে থাকে।

আমি অবাক হয়ে নদীর মুখের দিকে তাকাই। তোমাকে অত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

নদী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ইউনিভার্সিটি থেকে এলাম। খিদে পেয়েছে।

আমার রুমে আর কেউ ছিল না। আমি নদী আর সিরাজ। সিরাজ মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়ছে। সেই ফাঁকে আমি নদীর দিকে ভাল করে তাকাই। কি খাবে?

নদী তবুও আমার দিকে তাকায় না। নোখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, কিছু না।

তোমার তো খিদে পেয়েছে!

বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।

এখন তো দুটো বাজে, রিকশা পাবে না।

একটু পরে যাব।

তাহলে কিছু খাও।

না।

আমি তবুও বেল টিপি। পিয়ন এলে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বলি, দুটো পেস্টি।

নদী পিয়নটার দিকে তাকিয়ে গলা ভারি করে বলে, আনবে না। আমি খাব না।

আমি নদীর কথা গ্রাহ্য না করে বলি, তুমি যাও।

পিয়নটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার কথায় বেরিয়ে যায়। সিরাজ এসবের কিছুই খেয়াল করছিল না। মনোযোগ দিয়ে কাগজ পড়ছে। নদী একবার সিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে টেবিলের ওপর থেকে ম্যাচটা টেনে নেয়। তারপর একটার পর একটা কাঠি জ্বালাতে থাকে।

এই এক অভ্যেস নদীর। হাতের কাছে ম্যাচ পেলে কাঠি জ্বালাবে। কাজটায় ওকে বেশ মানায়। নদী যখন কাঠি জ্বালায় তখন ওর মুখে অন্য রকমের লাবণ্য। আমার যে কী ভাল লাগে। খানিক পর পুরো ম্যাচটা শেষ করে নদী ব্যাগ থেকে লাল বলপেন বের করে ম্যাচের কালো পিঠে কি লেখে। তারপর আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। আমি দেখি সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, 'অভদ্ধ মিথ্যুকের হাতে আমি কিছুই খাইনে'।

আমি অবাক হয়ে নদীর মুখের দিকে তাকাই। নদী তারপর একটাও কথা বলে না। বই খাতা হাতে বেরিয়ে যায়। আমি নদীর দিকে তাকিয়ে থাকি। এইসব মুহূর্তে আমি ঠিক বুঝতে পারি না আমার কি করা উচিত। আমি কি চিৎকার করে নদীকে ডাকব! কিংবা উঠে গিয়ে হাত ধরে নিয়ে আসব!

কিছুই করা হয় না। সিরাজ আছে সামনে। ও কি ভাববে!

রাগে দুঃখে আমার ভেতরটা জ্বলে। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়। চোখ ছলছল করে।

আমি আর একটা সিগারেট ধরাই। তারপর উদাস হয়ে টানতে থাকি। তখন সিরাজ উঠে। যাই দোসত, আমার একটু কাজ আছে। কোথায়?

ভাবীর এক ভাইয়ের বাসায় যেতে হবে।

যা।

সিরাজ চলে যেতেই আমার একটু অবাক লাগে। নদী অমন করে চলে গেল, অথচ সিরাজ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না কেন?

সিরাজ কি এসব ব্যাপারে নির্বিকার!

আমি টেবিলের ওপর থেকে ম্যাচটা তুলে আবার লেখাটা পড়ি। অভদ্ধ মিথ্যুক শব্দ দুটো মাথার ভেতর খট খট করে বাজে।

দুদিন আগে হঠাৎ করে নদীর সঙ্গে আমার দেখা। তখন এগারটা বাজে। তার আগের দিন সিরাজ ঢাকায় এসেছে। আমি সিরাজের সঙ্গে মহসিন হলে দিদারের রুমে ছিলাম। রাত একটা পর্যন্ত কেরুর জিন খেয়েছি। সকালবেলা উঠেছি দশটায়। চোখমুখ ফুলে ছিল। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে থাকলে আমার সহজে ঘুম আসে না। আমি ঘুমের জন্য মদ খাই। কখনও স্লিপিং টেবলেট। সোনেরিল, সিডাকসিন। কেন যে আজকাল মনে হয় জন্মের পর থেকে আমি কখনও সঠিক ঘুম ঘুমোইনি।

অথচ সেদিন দুপুরে নদীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তার দুদিন আগে এক সোমবার, সেদিন আমি বেশ কিছু টাকা পেয়েছি। নদী শাহবাগ থেকে পছন্দ করে আমাকে একশো বিশ টাকায় একটা নীল জিনসের শার্ট কিনে দিয়েছে। নীল শার্টে আমাকে কি সুন্দর মানায়! নদী বলে, তুমি নীল রঙ ছাড়া অন্য কিছু পর না।

এখানে একটা ভুল হয়ে গেল, নদী আমাকে তুমি করে বলে না। আপনি বলে, অথচ নদীর সঙ্গে আমি যখন মনে মনে কথা বলি, কিংবা নদীর কথা ভাবি তখন 'তুমি' করে নিই। ভাল লাগে। নদী আমাকে তুমি করে কবে বলবে?

নীল রঙয়ে আমাকে মানায় শুনে আমার ইচ্ছে হয়েছিল পুরো টাকার নীল জামা কাপড় কিনে নিই।

নদী চলে যাওয়ার পর আমি রমনা ভবনে গিয়ে একটা নীল জিনসের কাপড় কিনি। তারপর একটা চেনা দর্জিকে দশ টাকা বেশি দিয়ে একদিনের মধ্যে প্যান্টটা বানিয়ে নিই। কারণ নদী আমাকে বলেছিল দুদিন পর বুধবার নীল শার্ট পরে ওর সঙ্গে দেখা করতে। নদীকে চমকে দেয়ার জন্য আমি প্যান্টটাও বানিয়ে নিই। তারপর নদীর সঙ্গে দেখা করি। নদী কি আমাকে দেখে খুব খুশি হয়? সেদিনই বিকেলবেলা সিরাজ আসে। আমরা মহসিন হলে দিদারের রুমে থাকি। মদ খাই।

এসবের কয়েকদিন আগে, তিনটার দিকে নদীর সঙ্গে আমার দেখা। দিনটা খুব চমৎকার ছিল। সকাল থেকে সূর্যের তলায় এসে জমেছে মেঘ। রোদ মরে গিয়ে বিষণ্ন আলো ফুটে ওঠেছে চারদিকে। নদী বলল, এ রকম দিন আমার খুব ভাল লাগে।

আমারও।

আজ রোদ হয় বৃষ্টি হয়।

কি জানি বহুকাল পৃথিবীতে বৃষ্টি হয় না।

নদী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। কেন, সেদিনও তো হল!

মনে পড়ে না। ভুলে গেছি। কেন যে মনে হয় বহুকাল পৃথিবীতে বৃষ্টি হয় না, কোনও সুন্দর মেয়ে কাঁদে না।

মেয়েদের কান্না দেখার খুব সখ?

বুঝি না।

তুমি আসলে কেমন যেন। অদ্ভুত।

নদী সেদিন সুন্দর সাদা শাড়ি পরেছিল। পাড়টা চওড়া লাল আর সোনালী রঙয়ে মেশানো। নদীর সাদা কপালে লাল সূর্যের মতন টিপ। কাঁধে লাল নীল ডোরা কাটা ব্যাগ। বিষণ্ন আলোয় চারদিকে পৃথিবী সুন্দর করে নদী আমার পাশাপাশি হাঁটছিল।

আমরা ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে বসি।

তিনটের দিকে ক্যাফেটেরিয়ায় লোকজন থাকে না। খাঁ খাঁ নির্জনে কালো চেয়ার টেবিল পড়ে আছে। আমরা জানালার ধারে ছোট্ট একটি টেবিলে বসি। মুখোমুখি।

বসার পরই নদী একজন বেয়ারাকে নাম ধরে ডাকে। ক্যাফেটেরিয়ায়

আমি কখনও আসিনি। নদী প্রায়ই আসে। ক্লাস শেষ করে এখানে বসে চা খেয়ে যায়। তখন ওর সঙ্গে কে কে থাকে।

আমি কল্পনায় দেখি এই চেয়ারটায় নদী বসে আছে, আর ওর চারপাশে অনেকগুলো যুবক। একজনের মুখে দাড়ি। নদী খুব হাসছে।

নদী বলল, কি ভাবছ?

আমি প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাই, তারপর বলি, কিছু না।

নিশ্চয় কিছু ভাবছ।

সত্যি না।

তাহলে আনমনা ছিলে কেন?

কখন?

মিথ্যে বল না। তুমি আমার সঙ্গে সবসময় মিথ্যে কথা বল।

আর বলব না।

শুনে নদী মিষ্টি করে হাসে। নদীর হাসি দেখে আমার মনে হয় এক সঙ্গে একটা সাদা গোলাপ থেকে লাফিয়ে ওঠল হাজারটা প্রজাপতি।

তাহলে বল, কী ভাবছিলে?

তুমি এখানে প্রায়ই আস?

হ্যাঁ।

তোমার সঙ্গে কে কে থাকে?

আমার বন্ধুরা।

এইসবই ভাবছিলাম।

তখন বেয়ারা চা দিয়ে যায়। লেবু চা। দেখে আমি বলি বিসকিট দাও।

নদী বলে, তোমার খিদে পেয়েছে?

হ্যাঁ।

তোমার তো ঘন্টায় ঘন্টায় খিদে পায়। আমারই ভুল হয়েছে।

আমি সিগারেটে টান দিয়ে বলি, দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি।

কোথায় ছিলে?

অফিসে।

বাসায় যাওনি?

না।

তোমার ঠিক গ্যাস্ট্রিক হবে।

হোক।

অসুখ খুব ভাল লাগে।

হ্যাঁ। আমার এখন বয়স চব্বিশ বছর দুমাস। আমি আর পনের বছর দশ মাস বাঁচতে চাই।

কেন?

কি হবে বেশি দিন বেঁচে থেকে!

তখন বেয়ারা বিসকিট দেয়। আমি চায়ে বিসকিট ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে থাকি। তারপর আনমনে বলি, গ্যাস্ট্রিক হলে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। আমার ফেবারিট অসুখ ক্যান্সার।

বাজে কথা বল না তো। নদী রেগে যায়।

দু চুমুক চা খেয়েছি, নদী বলল, এটা তো খেয়াল করিনি।

কি?

চা খেলে তোমার একটুও শব্দ হয় না। শব্দ করে কেউ চা খেলে আমার যে কী রাগ লাগে।

শব্দ হত। অভ্যেসটা ছেলেবেলায় নষ্ট হয়ে গেছে।

কি করে?

আমাদের দুধভাত খেতে দিয়ে মা লাঠি নিয়ে সামনে বসে থাকত। শব্দ হলে মার। সেই ভয়ে শব্দ ভুলে গেছি।

তুমি খুব অহ্লাদি ছেলে না?

কী রকম!

তুমি কথা বললে আদুরে বাচ্চার মতো ঠোঁট ফুলে যায়।

তাই!

হ্যাঁ, আমি অনেকদিন খেয়াল করেছি।

আর কি কি খেয়াল করেছ?

তুমি খুব ঝগড়াটে, রাগী। আর আমাকে খোঁচা মেরে কথা বল।

আমি হাসি।

নদী তখন একটা বিসকিট তুলে আমার চায়ের কাপে ছেড়ে দেয়। তারপর বলে, খাও।

কেমন করে খাব?

চামচে তুলে নাও।

আমি চামচে তুলতে যাব, বিসকিটটা ওঠে না। নদী তখন সামনের কৌটা থেকে এক চামচ লবণ তুলে বাচ্চা মেয়ের মতো মনোযোগ দিয়ে চায়ে

মেশাতে থাকে। আমি কথা বলি না। তাকিয়ে তাকিয়ে নদীকে দেখি। মনে হয় নদী আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। গাছ তলায় বসে ধুলোবালির সংসার করছি আমরা।

নদী বলল, খাও।

যাঃ এটা খাওয়া যাবে নাকি!

এক চুমুক খাও। এত যত্ন করে বানালাম।

বিষ হয়ে গেছে তো।

বিষই খাও।

তুমি বললে পুরোটা খেয়ে নেব।

বিষপান করে মরে যাবে?

হ্যাঁ।

দরকার নেই। এটা খেলে মরবে না। এক চুমুক খাও।

নদী খুব জেদী মেয়ে। ও যা বলবে তাই করবে।

কিন্তু এই জিনিসটা আমাকে খেতে হবে ভেবে ভেতরে ভেতরে রেগে যাই। ঠিক আছে খাব। এসব খাইয়ে নদী যদি খুশি হয়, হোক। আমি চায়ের কাপ তুলি। চুমুক দিই। জিনিসটা ততক্ষণে একদম জল হয়ে গেছে। নুনকটা জল। এক চুমুক খেয়ে আমার জেদ চেপে যায়। পুরোটা খেয়ে ফেলব। নদী দেখুক।

আরেক চুমুক খেতে যাব, নদী বলল, চলে যাব কিন্তু।

কেন?

তোমাকে আমি পুরোটা খেতে বলিনি।

তাতে কি, তুমি দিয়েছ...

কিন্তু আমি তোমারে পুরোটা খেতে বলিনি।

আমি এরপর আর একটু বাড়াবাড়ি করলে নদী ঠিকই উঠে চলে যাবে। একদিন নদীদের বাসায় গিয়ে কি কথায় আমি কিছু না বলে চলে এসেছিলাম। তার পরদিন নদী আমার অফিসে এসে একটাও কথা না বলে এক মিনিটও না বসে চলে গিয়েছিল। নদী এই রকম। যতটুকু অভিমান করব ঠিক ততটুকু অভিমান ফেরত দেবে।

আমি চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখি।

নদী বলল, তুমি সেদিন রিকশা থেকে পড়ে গিয়েছিলে কেন, আমি পরে বুঝতে পেরেছি।

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন?

তুমি মদ খেয়েছিলে।

তারপরও তো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তুমি বলনি কেন? আমি ভেবেছিলাম তুমি নিজেই বলবে।

আমি তারপর চুপ করে থাকি। সেদিন রাতেরবেলা নদীদের বাসা থেকে নদীকে না বলে চলে এসেছিলাম। বেরুনোর পরই মনে হয়েছে এ আমি কি করলাম। নদীকে না বলে চলে এলাম। নদী কি আমার কথা ভেবে কষ্ট পাবে না? নদীকে আমি কখনও কষ্ট দিতে চাই না। তার পরমুহূর্ত থেকে কি যে খারাপ লাগতে থাকে। একবার ইচ্ছে করে নদীর কাছে ফিরে যাই, গিয়ে বলে আসি, নদী, তুমি আমার জন্য কষ্ট পেয়ো না।

নদী কি আমার জন্য কষ্ট পায়!

জানি না। তবুও আমার সেদিন ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু তখন অনেক রাত। এত রাতে কোনও বাসায় কোনও মেয়ের কাছে যাওয়া যায় না। মন খারাপ করে আমি একটা বারে ঢুকি। পর্যটন কর্পোরেশনের বার। ষোল টাকা পেগ কেরুর জিন। চার পেগ নিট খেয়ে টাল মাটাল হয়ে যাই। যখন রিকশায় চড়ি তখন ঝির ঝিরে বৃষ্টি। সঙ্গে হাওয়া। নেশাটা বেড়ে যেতে থাকে। শ্যামবাজারের কাছাকাছি এসেছি হঠাৎ পেছন থেকে একটা রিকশা ধাক্কা দেয়। তেমন জোর ধাক্কা নয়, কিন্তু আমি টাল সামলাতে পারি না। হুড়মুড় করে পড়ি রাস্তার ওপর। পড়ে টের পাই আমি সব ভুলে যাচ্ছি। জলকাদার রাস্তা মনে হয় বিছানা! ঘুম আসতে থাকে। রিকশাঅলা আমাকে টেনে তোলে। গেণ্ডারিয়ায় পৌঁছে দেয়। গেটের কাছে নেমে রিকশাঅলাকে কত দিই খেয়াল থাকে না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা উঠেছে দিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু বাসায় ঢুকতেই আমাকে নিয়ে কেলেঙ্কারি। মা বাসায় নেই, সপ্তাহখানেক হলো দেশে গেছে। ঊষা জ্বর নিয়ে জেগে বসে আছে আমি বাড়ি ফিরলে আমাকে খেতে দিয়ে তারপর ঘুমুবে। পাশের ঘরে ভাই ভাবী শুয়ে পড়েছে। বড় ভাইর জ্বর। প্যারাটাইফয়েড হয়েছে।

আমি ঘরে ঢুকতেই ঊষা জ্বরজারি ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, একি! কি হয়েছে?

আমি মাতাল গলায় হেসে উঠি, কি হয়েছে?

ঊষা ততক্ষণে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ঊষা আমার ফেবারিট বোন। ক্লাস নাইনে পড়ে। আমার জন্য অদ্ভুত টান ঊষার। এই বয়সেই ঊষা বুঝতে পেরেছে এই সংসারে আমি একটু অবহেলিত! আমাকে ভালবাসার কেউ নেই। না মা, না কোনও ভাইবোন!

ঊষার কান্নাকাটি শুনে সবাই জেগে যায়। জ্বর নিয়ে উঠে আসে ভাই ভাবী। অন্য ভাইবোনেরা এসে ঘিরে ধরে আমাকে। কি হয়েছে?

এত আয়োজন দেখে আমার নেশাটা ঝাৎ করে কেটে যায়। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। সবাই ধরে নেয় আমাকে কেউ মেরেছে। মেরে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। গায়ে ময়লা কাদা লেগে আছে।

ভাইয়া জিজ্ঞেস করে, কে মেরেছে আমাকে বল। এ কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি হড়হড় করে বমি করে দিই। একেবারে ঊষার গায়ে। বড় ভাই কি বোঝে কে জানে, গম্ভীর গলায় বলে, ঊষা ওকে শুইয়ে দে।

ঊষা আমাকে ধরে ধরে বিছানায় নিয়ে শোয়ায়। সেই থেকে ঊষার কাছে আমি বড় অপরাধী হয়ে আছি।

এখন নদী মদ খাওয়ার কথা বলায় আমি অকপটে স্বীকার করি। নদী মন খারাপ করে বলে, কেন খাও?

সেদিন তুমি আমাকে অমন করে বলেছিলে কেন?

কি বলেছি?

নদী যে কি বলেছিল আমার মনে পড়ে না।

আসলে নদী আমাকে কিছু বলেনি। আমি মনে মনে একটা দুঃখের গল্প তৈরি করে নিয়েছিলাম। নদীকে না বলে চলে এসেছিলাম। আমি আবার সিগারেট ধরাতে যাব, তখন নদীর দিকে চোখ যায়। দেখি নদী খুব দুঃখী মুখ করে তাকিয়ে আছে। চোখ ছলছল করছে নদীর।

আমি সিগারেট না ধরিয়ে বলি, কি হয়েছে?

নদী কথা বলে না।

আমি আবার বলি, নদী তোমার কি হয়েছে?

নদী বলল, তুমি আমাকে কথা দাও, আর কখনও মদ খাবে না।

আমি চুপ করে থাকি।

নদী বলে, কি হল?

খাব না।

সত্যি!

সত্যি।

তারপর চালাকি করে বলি, তোমাকে কথা দেয়ার পরও যদি খাই তুমি বুঝবে কি করে?

তোমার দিকে তাকালেই আমি সব বুঝে যাব।

ধরো যেদিন খেয়েছি তার সাতদিন পর যদি তোমার সঙ্গে দেখা করি। তবুও।

কিন্তু তারপরই যেদিন নদীর পছন্দ করা নীল জিনসের শার্ট, আর নদীকে চমকে দেয়ার জন্য নীল জিনসের প্যান্ট পরে নদীর সঙ্গে দেখা করতে গেছি সেদিনই বিকেলবেলা সিরাজ আসে। সেদিনই দিদারের রুমে বসে মদ খাই।

খাওয়ার সময় কি একবারও আমার নদীর কথা মনে পড়েনি!

পড়েছে। প্রথম সীপ নেয়ার সময়ই! চোখের ওপর ভেসে উঠেছে নির্জন ক্যাফেটেরিয়া। নদীর কোমল বিষণ্ন চোখ। সেখানে ছলছল মায়াবী জল। তারপরই মনে হয়েছে আসলে এসবের কিছুই ঘটেনি। নদী কেন অমন করে আমাকে বারণ করবে। ঘটনাটা আমি নদীকে তুমি করে বলার মতো মনে মনে তৈরি করে নিয়েছি।

পরদিন সকালবেলাই নদীর সঙ্গে দেখা। আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনে। আমি আর সিরাজ ফিরছি। ঝলমলে রোদে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। নদী নীলবুটিদার কামিজ আর সাদা শালোয়ার পরে, হাতে বইখাতা, রাস্তার ওপর রোদে দাঁড়িয়ে, একটা হুড তোলা রিকশায় বসা তার দুই বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

নদীকে দেখে আমি দাঁড়াই। কথা শেষ করে নদী আমার কাছে আসে। তারপর আমার মুখের দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। দেখে আমি ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠি। ধরা পড়ে যাই। নদীকে বলি, আমি কাল হলে ছিলাম।

নদী একটাও কথা বলে না। চলে যায়। তারপরই আজ দুপুরে অশুদ্ধ, মিথ্যুক।

সিরাজ চলে যাওয়ার খানিক পর পিয়ন এসে আমাকে পেন্ট্রির ঠোঙাটা দেয়। নদীর জন্য আনতে পাঠিয়েছিলাম। নদী নেই। পিয়নটা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। আমি ম্লান হেসে যেন নিজের কাছে বলছি এমন গলায় বলি, চলে গেছে।

তারপর পিয়নের হাত থেকে বাকি পয়সাগুলো নিয়ে পেন্ট্রির ঠোঙা হাতে বারান্দায় যাই। চারদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। ঠোঙাটা তিনতলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিই দূরের রাস্তায়। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ি। সারাটা বিকেল পাগলের মতো ঘুরে বেড়াই শহরে। আমার কিছু ভাল্লাগে না।

গোবিন্দপালের দোকানে এসে দেখি রতন, মাসুদ আর রহমান বসে আছে। তিনজনের হাতেই সিগারেট। খুব উত্তেজিত গলায় কি সব আলোচনা

করছে। দোকানে আর কোনও লোক নেই। ক্যাশ টেবিলে বসে আছে বুড়ো গোবিন্দপাল। দোকানের পেছন দিকে দু একজন বয় বেয়ারা।

আমাকে দেখে রতন বলল, কি খবর দোস্ত? অনেককাল পর এদিকে এলি!

আমি কোনও কথা বলি না। একটা চেয়ার খালি ছিল, বসে পড়ি।

মাসুদ আর রহমান অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ব্যাপারটা খেয়াল করে আমি ম্লান হাসি।

কেমন আছিস তোরা?

রহমান বলল, আর আমাদের থাকা!

মাসুদ বলল, অনেকদিন পর এলি, ভাল সিগারেট খাওয়া। স্টার খেতে খেতে মুখটা পচে গেল।

আমি কোনও কথা বলি না। বিকেলবেলা এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছি। পাঁচ ছ'টা খাওয়া হয়েছে। প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে প্যাকেটটা বের করি। আমি কখনও বুক পকেটে সিগারেট রাখি না। লোকে ভাল সিগারেট দেখলেই খেতে চায়। কিন্তু এখন রহমান মাসুদদের সিগারেট খাওয়াতে আমার একটুও খারাপ লাগছে না। খানিক আগে স্কুটারঅলাকে মারলাম। আমি কখনও কাউকে এভাবে মারিনি। আজ যে কী হল। এখন মনে হচ্ছে লোকটাকে আসলে আমি মারিনি। মেরেছে অন্য কেউ।

রতন বলল, চা খা।

বল।

রতন চেঁচিয়ে বলল, দাদা এক কাপ চা।

গোবিন্দপালের দোকানে চায়ের দুটো সিস্টেম আছে। হাফ কাপ, ফুল। রতনরা অনেক সময় এক কাপ চা দুজনে ভাগ করে খায়। এখন আমার অনারে ফুল কাপ হচ্ছে।

আমি বললাম, তোরা খাবি না?

না, অনেক হয়ে গেছে।

তারপর আর কেউ কোনও কথা না বলে টেবিলের ওপর থেকে আমার বেনসনের প্যাকেট নিয়ে সিগারেট ধরায়। আমি কি আড় চোখে একবার প্যাকেটটার দিকে তাকাই। আমার কি বুকের ভেতর একটু কষ্ট হয়! দামী সিগারেট শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাইশ টাকা প্যাকেট।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিই। তারপর রতন, মাসুদ আর রহমানের

পাশে বসে থেকেও একলা হয়ে যাই। রতনরা আগের আলোচনায় ফিরে যায়। সিগারেট শেষ হলে আবার আমার প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরায়। কেন যে আমার মনে হয় ওদের সঙ্গে কোথায় যেন আমার বিরাট ব্যবধান। ওরা পারে, ওরা অবলীলায় সব পারে। সব পরিবেশের জন্য ওরাই সঠিক মানুষ, আমি নই।

দশটার দিকে আমি বলি, উঠি রে।

মাসুদ বলল, কোথায় যাবি?

বাসায়।

এত সকালে বাসায় গিয়ে কী হবে?

ভাল্লাগছে না।

রহমান বলল, তুই তো আজকাল ভাল চাকরি করছিস। আজ আমাদের একটু মাল খাওয়া না।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে নদীর কথা। মদ খাই বলে নদী আমাকে অশুদ্ধ বলে গেল। বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে। বলি, আমি মাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি দোস্ত।

তিনজন এক সঙ্গে হাঁ করে তাকাল আমার দিকে।

বলিস কি?

হ্যাঁ।

রতন বলল, প্রেমে পড়েছিস নাকি?

কেন, প্রেমে পড়লে লোকে মাল খাওয়া ছেড়ে দেয়?

হয় ধরে নয় ছেড়ে দেয়।

কেন?

জলের মতো সোজা। প্রেমিকা পছন্দ করলে খায়, অপছন্দ করলে ছেড়ে দেয়।

রহমান বলল, বাঙালি মেয়েরা অবশ্য অপছন্দই করে বেশি।

আমি গলা ভারি করে বলি, ধরে নে তাই।

মাসুদ বলল, মালটা কেমন দোস্ত?

শুনে আমার মাথার ভেতরে লাফিয়ে ওঠে রক্ত। গা চিড়বিড় করে ওঠে। নদীকে কেউ অপমান করলে আমি সহ্য করতে পারব না। আমি কি ঝুটারঅলাটার মতো মাসুদকেও মারব! এক্ষুণি! তারপরই মনে হয়, ঝুটারঅলাটাকে তো আমি মারিনি। মেরেছে অন্য কেউ, কোনও শক্তিমান

পুরুষ। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মাসুদকে আমি কিছু বলতে পারি না। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাই। প্যাকেটে তখন পাঁচ-ছটা সিগারেট আছে। আমি প্যাকেটটা তুলে পকেটে ভরি। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠি।

রতন বলল, সত্যি যাচ্ছিস?

হ্যাঁ।

রহমান বলল, তুই না হয় ছেড়ে দিয়েছিস দোস্ত। আমরা তো আর ছাড়িনি। তিনটে বোতলের দাম দিয়ে যা। বাংলা। তিন চৌদ্দং বেয়াল্লিশ। পঞ্চাশ টাকার একটা নোট দিলেই হবে।

আমার কাছে অত টাকা নেই।

মাসুদ বলল, কত আছে?

আট দশ টাকা হবে।

যা শালা, চাপা মারিস না। তোর পকেটে থাকবে আট দশ টাকা! আসলে আমার পকেটে তখন অনেক টাকা। তিনশ'র বেশি হবে। আমি ওদের কাছে বলতে চাই না। সিগারেটগুলো শেষ করেছে তাতেই আমার বুকের ভেতরটা হা হা করছে।

আমি বলি, আরেকদিন খাওয়াব তোদের।

আর খাইয়েছিস! ছমাসে তো তোর আর চেহারাই দেখা যাবে না।

কথা দিচ্ছি, আগামী মাসে মাইনে পেয়েই তোদের খাওয়াব।

তুই মাইনে পাস কবে?

সাত তারিখে?

ঠিক আছে আজ তেইশ তারিখ আর চৌদ্দ দিন পর ঠিক সন্ধে সাতটায় তোকে এখানে দেখতে চাই।

ও কে।

মনে-থাকবে তো?

অবশ্যই।

আমি তারপর আর কোনও কথা না বলে গোবিন্দপালের দোকান থেকে বেরোই। বেরিয়েই রিকশা। সোজা গেণ্ডারিয়া। রিকশায় বসে আমার আবার মনে পড়ে ঝুটারঅলাকে বিশটা টাকা দিয়েছি। বেদম মেরেছি। বাঁ হাতে, ডান হাতে। আপনা-আপনি আমার হাত দুটো একসঙ্গে হয়ে যায়। এক হাতে অন্য হাত পরখ করি। প্রথমে ডান হাতে বাঁ হাত। তারপর বাঁ হাতে

ভাল হাত। ছুঁয়ে বোঝা যায় না কিছু। সত্যি কি আমি মেরেছিলাম লোকটাকে! আমিই বিশটা টাকা দিয়েছিলাম।

বাড়ি এসে চিৎকার করে উষাকে ডাকি। উষা ভাত দে।

উষা বসেছিল, মা ছিল ঘুমিয়ে। আমার হাঁক ডাকে উঠে আসে। তারপর বাথরুমে যেতে যেতে বলে, হাত মুখ ধুয়ে নে।

আমি হাত মুখ না ধুয়েই জামা কাপড় না ছেড়েই খাওয়ার টেবিলে বসেছি। বললাম, খিদে পেয়েছে! আগে ভাত খাব, তারপর।

হাত মুখ ধুতে, জামা কাপড় ছাড়তে কতক্ষণ লাগে!

তুমি কথা বল না তো, যাও।

মা একটু থতমত খেয়ে দাঁড়ায়। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলে, তোর আজকাল কি হয়েছে বলত! অত রেগে থাকিস কেন?

আমি কথা বলি না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি উষা টেবিলে ভাত তরকারি সাজিয়ে দিচ্ছে।

আমি কখনো চাকর বাকরের হাতে খাই না। বাসায় সবাই জানে। চাকর বাকরগুলোও। আমি বাসায় ঢুকলে ওরা তিনজন তিন দিকে সরে যায়।

কিন্তু তরকারির পেয়ালায় মাছ দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমি মাছ খাই না। কথাটা আমাদের সংসারের সবাই জানে। এ কারণে রোজই আমার জন্যে কিছু না কিছু মাংসের ব্যবস্থা থাকে।

আজ নেই কেন?

আমি উষাকে জিজ্ঞেস করি, মাংস কই?

আজ তো মাংস আনেনি।

কেন?

মা ততক্ষণে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলল, বাজারের টাকা শেষ। ধার করে আজ বাজার হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে ভাইয়া টাকায় নেই। ব্যবসার কাজে চিটাগাং গেছে। চার পাঁচদিন আগে চলে আসার কথা। বোধহয় মাল ছাড়াতে পারেনি। ঝামেলা টামেলা বেঁধেছে। মাকে যা টাকা পয়সা দিয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে। তার ওপর ভাবীও নেই বাসায়। বাপের বাড়ি। সে থাকলেও হত। ভাবীর কাছে টাকা পয়সা থাকে।

আমি বললাম, সকালবেলা আমাকে বলনি কেন?

বললে যেন তুমি দিতে! চাকরি বাকরি কর, শুনেছি চৌদ্দ পনের শ'

টাকা মাইনে পাও। একটা পয়সা তো দাওই না সংসারে, সপ্তায় সপ্তায় আবার টাকা নাও বাড়ি থেকে। তোমার কাছে কি চাইব?

শুনে আমার খুব প্রেস্টিজে লাগে। মাথার ভেতর ঝনঝন করে ওঠে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি ভাতের থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিই। তারপর হনহন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। পেছন থেকে উষা দুতিন বার চিৎকার করে ডাকে। আমি গ্রাহ্য করি না। ফিরব না, এখানে আমি আর কখনও ফিরব না।

রাস্তায় বেরিয়ে মনে পড়ে উষা আজ রাতে খাবে না। মার সঙ্গে খানিকক্ষণ ঝগড়া করবে। তারপর কাঁদবে। তারপর ঘুমিয়ে পড়বে। উষার জন্য আমার একটু একটু কষ্ট হতে থাকে। আমার জন্য উষা আজ রাতে না খেয়ে থাকবে! ঠিক আছে আমিও আজ রাতে খাব না। কিচ্ছু খাব না।

কিন্তু এখন আমি কি করব! কোথায় যাব, কার কাছে যাব! একবার ভাবি মহসিন হলে দিদারের রুমে যাই, আবার ভাবি মতিঝিলে আফজালের বাসায় যাই। তারপরই মনে পড়ে এতরাতে ওদের ওখানে গেলে নিজের কাছেই খারাপ লাগবে। উদ্ভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত মনে হবে। না যাব না, কোনও শালার কাছে যাব না। সারারাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। পকেটে তো কারফিউ পাস আছেই। পুলিশে ধরলেও ছেড়ে দেবে।

আমি একটা চেনা রিকশাঅলাকে ডেকে বলি, চল ঘুরবি আমার সঙ্গে।

তারপর রিকশা নিয়ে রাতের ঢাকা শহরে ঘুরতে থাকি। এগারটার দিকে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। এভাবে ঘোরার মানে কি! আমার একটা কিছু করা উচিত। কিন্তু কি করব, আমি এখন কি করব! এসব ভাবতে শাঁখারী বাজারে কৃষ্ণর দোকানে গিয়ে ঢুকি। রাত এগারটা বাজে, কৃষ্ণর দোকান খালি। আমাকে দেখে কৃষ্ণ বলে, আজ হবে না। বন্ধ করে দিছি। আমি অনুনয় করে বলি, একটা কেরুর পাইট দাও, পাঁচ মিনিটের মধ্যে খেয়ে চলে যাব।

কৃষ্ণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝে কে জানে। বলে আসেন।

তারপর ভেতরে নিয়ে বসায়। কেরুর ইমপেরিয়াল হুইস্কির একটা পাইট দেয়। আমি কোনও কথা না বলে ছোট্ট গেলাসে ঢালি আর খাই। রিকশাঅলা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। কথাটা আমার মনে আছে।

তিন গেলাসের মাথায় আমার একবার নদীর কথা মনে পড়ে। মদ খাই বলে নদী আমাকে অশুদ্ধ বলেছে। মদ খেয়ে নদীর কাছে স্বীকার করিনি বলে

মিথ্যুক বলেছে। কাল যদি নদীর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমি কি নদীর কাছে বলব, নদী কাল রাতেও আমি মদ খেয়েছি! কিংবা কাল কি আমার মনে হবে আমি আসলে মদ খাইনি। খেয়েছে অন্য কেউ!

এসব ভাবতে ভাবতে পাইটটা শেষ করি। রাতেরবেলা কিছু খাওয়া হয়নি। দুপুরবেলাও ভাত খাইনি। পুরো পাইট হুইস্কি খেয়ে হঠাৎ আমার চোখে চারদিকের পৃথিবী ভেজা পাউরুটির মতো তুলতুল করতে থাকে। উঠে দাঁড়াতে যাব পা দুটো মনে হয় নরম কাদার ভেতর গেঁথে যাচ্ছে। মাথাটা কাটা ঘুড়ির মতো বার দুয়েক গোতা খায়।

কৃষ্ণ কি বোঝে কে জানে, আমাকে ধরে ধরে রিকশায় তুলে দেয়। কৃষ্ণর পয়সা আমি পাইটটা নেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি। এখন কোনও দেনা পাওনার ব্যাপার নেই।

রিকশাঅলা বলল, বাইত যাইবেন ভাই?

আমি কথা বলতে পারি না। মুখে বিদ্‌ঘুটে শব্দ করি। আসলে আমার তখন কোনও বোধ নেই। দুহাতে রিকশার দুদিক ধরে রেখেছি। মাথাটা জবাই করা মুরগির মাথার মতন লটপট করছে। চোখ চেয়ে আছে কি বুজে আছে বুঝতে পারি না।

খানিকপর রিকশাঅলা আমাকে বাড়ির গেটে নামিয়ে দেয়। আমি পকেটে হাত দিয়ে কেমন করে যে একটা দশ টাকার নোট বের করি। তারপর পুরোটাই রিকশাঅলাকে দিয়ে দিই।

আমাদের গেট বন্ধ হয়ে যায় এগারটায়। এখন কটা বাজে কে জানে। গেট যে বন্ধ হয়ে গেছে এটা মাতাল অবস্থায়ই বুঝতে পারি। তবুও গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। ধুম ধুম করে গেটে দুটো কিল মারি। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে কুকুর।

আমাদের বাড়িটা প্রোটেকটেড। দশটি ভাড়াটে। সবাই ব্যবসায়ী। বাড়িঅলা নিজেও। এজন্যে গেটে দারোয়ান। ফকির ফাকরাও ঢুকতে পারে না বাড়িতে। দুটো গেট। প্রথমটা কাঠের, তারপরেরটা লোহার শিকের। দুহাতে ধাক্কা দিলে দুটো দুদিকে সরে যায়। কাঠের গেটে বিরাট তালা পড়ে রাত এগারটায়। চাবিটা চলে যায় তিন তলায় বাড়িঅলার কাছে। দারোয়ানের বাবারও আর সাধ্যি নেই খুলে দেয়ার। তার ওপর গেটে তালা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দেয়া হয় তিনটে বাঘা কুকুর। সারাদিন ঘরে বন্দী থাকে কুকুরগুলো। রাতেরবেলা ছাড়া পেয়ে সে কি উল্লাস তাদের।

কুকুরের ডাক শুনে আমি বুঝে যাই, আজ আর হবে না। তখন আমায় চোখ টানছে বেদমসে।

এত রাতে এ অবস্থায় কোথায় যাব, ভেবে পাই না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর কাঠের গেট আর লোহার গেটের মাঝখানের বাথরুম সাইজের জায়গাটায় শুয়ে পড়ি। পায়ের কাছে লোহার গেট, মাথার কাছে কাঠের গেট। বাঃ কি জায়গায় শুয়েছি শালা। ঘুম একখান যা হবে না!

আমি সেন্ডেল দুটো একত্র করে বালিশ বানাই। ভাইয়া কলকাতা থেকে এনে দিয়েছিল। কলকাতার বাটা ভারি আরামদায়ক! মাথায় দিয়ে দেখি, একদম ফোমের বালিশ।

মেঝের ঠাণ্ডায় আর হুইস্কির নেশায় আমার তখন কি যে ঘুম আসছে! আঃ কতকাল ঘুমাই না আমি। আয় ঘুম, আয়। ঘুম, প্রিয় ঘুম।

ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে আমার একবার নদীর কথা মনে পড়ে। অন্ধকারে মাতাল দুহাত তুলে করজোড়ে আমি তারপর নদীর উদ্দেশে বলি, ক্ষমা কর। আমাকে ক্ষমা কর।

pathfinder

নদী

আজ সকাল থেকে আমার অকারণেই খারাপ লাগছে। আজকাল এ রকম হয়। হঠাৎ হঠাৎ নিজেকে এত দুঃখী লাগে। মনে হয় পৃথিবীতে আমায় কেউ ভালবাসার নেই। কেবল দুঃখ দেয়ার আছে।

আজ সকালবেলা ঘুম ভাঙার পরই আমার ওর কথা মনে পড়েছে। আমি তখনও বিছানায় শুয়ে। খানিক আগে আজান হয়ে গেছে। এখন চারদিক ফর্সা হচ্ছে দ্রুত। কাক ডাকছে। দূরের রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার শব্দ। রিকশার টুংটাং। আমাদের বাসায় সবাই ঘুমে। উঠবে খানিকটা বেলা করে। ভাইয়া অফিসে যাবে, নুপু হারমোনিয়াম নিয়ে বসবে রেয়াজ করতে।

নুপুটা আজকাল কেমন হয়ে যাচ্ছে। একটু আয়েশি। আগে খুব সকালবেলা উঠত। উঠেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসত। তারপর মায়াবী সুরে ভৈরবী রাগ করত! ওর রেয়াজের শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙত।

আজকাল নুপু ওঠে অনেকটা বেলা করে। দু একদিন ভাইয়া অফিসে যাওয়ার সময় ডেকে জাগায়। তারপর ধমকে বসায় রেয়াজ করতে। আমিও বকাঝকা দিই। তুই কি হচ্ছিস দিন দিন, বলত! নুপু কথা বলে না। এমনিতে বড় চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে। এখন তো তবুও একটু আধটু কথা বলে। আগে সাতচড়েও রা করত না। কদিন আগে হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে নুপুকে খেয়াল করি। ও তখন রেয়াজ করছে। কোনও দিকে খেয়াল নেই। চোখ ঢুল ঢুল, কি একটা ক্লাসিক্যাল করছে। আমি আমার পড়ার টেবিলে বসে নুপুকে খেয়াল করে চমকে উঠি। নুপু'র মুখে আলাদা লাবণ্য এসে গেছে। শরীর কেমন ভারি ভারি। আয়েশি। দেখে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। নুপু এক দুরন্ত বয়সে পড়েছে। আমি আমার এই বয়সটা পাঁচ বছর আগে পেরিয়ে

এসেছি। ভেবে দুঃখ হয়! কিন্তু সত্যি বলতে কি আমি টের পাইনি। কিচ্ছু টের পাইনি। ওই বয়সটা কখন এল, কখন চলে গেল। নুপুর তো এসময় একটু আয়েশি হওয়ার কথাই। প্রত্যেকেই হয়। আমিও কি হইনি! মনে পড়ে না, আমার আজকাল কিচ্ছু মনে পড়ে না।

সকালবেলা আজ ঘুম ভেঙে আমার ওর কথা মনে পড়েছে। কিছুকাল ধরে ওর কথা যখন তখন মনে পড়ে। কেন যে এরকম হয়। আগে তো কেবল অমুরই কথা মনে পড়ত। যখন তখন অমুর আছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করত। মাস কয়েক ধরে কেমন যে হয়ে গেছি। অমুর সঙ্গে দেখা হয় না অনেকদিন। মাস দুয়েক হবে। এক সঙ্গে এতদিন অমুকে না দেখে আমি কখনো থাকিনি। পর পর তিন দিন দেখা না হলে রাতেরবেলা ঘুম হত না। কান্না পেত। কত রাত যে অমুর জন্যে কেঁদে কাটিয়েছি। অথচ দুমাস দেখা নেই, অমুর জন্যে আমার আর তেমন কষ্ট হয় না।

শুনেছি অমু চাকরি পাল্টেছে। কোনও একটা জাপানি ফার্মে হাজার দেড়েক টাকা মাইনের ভাল চাকরি পেয়েছে। শুনে আমার কি খুব অভিমান হয়েছিল!

নতুন চাকরি পেল সেই খবরটাও আমাকে জানাল না। এ কারণেই কি আমি নিজেও অমুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিনি!

কি জানি। কিছু বুঝতে পারি না।

কিন্তু ওর সঙ্গে দুদিন দেখা না হলে আমি আগের সেই কষ্টটা একটু একটু টের পাই। নিজেকে খুব দুঃখী মনে হয়। খেতে ভাল্লাগে না, ক্লাস করতে ভাল্লাগে না। রাতেরবেলা ঘুম আসে না। কান্না পায়। ও কি আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে!

আজ সকালে আমার ওর কথা মনে পড়ল কেন? এটা তো উচিত নয়। আমি যে অমুকে...। দুবছর আগেই অমুর সঙ্গে আমার সব কথা হয়ে গেছে। অমুর কথা আমাদের বাসার সবাই জানে। আমার কথা অমুদের বাসার সবাই জানে। তাহলে?

ওর কথা মনে পড়ার পর থেকেই আমি এসব ভাবছি। আমার এ রকম হচ্ছে কেন। বুকের ভেতর অসম্ভব কষ্ট হয়। এই কষ্টের কথা আমি কাকে বলব! অমুকে না ওকে!

অমুকে বললে সে কোনও কথা বলবে না। ভাববে এসবের জন্যে সে দায়ী। ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাবে। ওকে বললে ও হাসবে। ও বড় নিষ্ঠুর।

শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছি, ভাইয়া ডাকল। উঠে পড়তে বোস। তোর না আজ পরীক্ষা।

তখন আমার পরীক্ষার কথা মনে পড়ে।

আজ ক্লাসে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। কাল রাতে একটু পড়াশোনার চেষ্টা করেছিলাম। হয়নি। বইখাতা গুটিয়ে রেখেছি আজ সকালে পড়ব। কিন্তু সকালবেলা ঘুম ভেঙেই আমার ওর কথা মনে পড়ে। ঘুম ভেঙে যে কদিন ওর কথা মনে পড়েছে সে কদিন ঠিক ঠিক ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। আজও কি হবে!

এসব ভাবতে ভাবতে উঠি। হাতমুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে বসি। বইপত্র নাড়ি-চাড়ি। পড়া হয় না। মাথায় কিছু ঢোকে না। পরীক্ষাটা দেব না। ইউনিভার্সিটিতেই যাব না আজ, ঠিক করে ফেলি।

খানিক পর ভাইয়া অফিসে যায়। নুপু উঠে চা করে এক কাপ আমাকে দেয়, আরেক কাপ নিজে নেয়। তারপর রেয়াজ করতে বসে। আমি চা খাওয়া শেষ করে হঠাৎ খেয়াল করি নুপু অনেকক্ষণ ধরে রেয়াজ করছে। এতক্ষণ শব্দটা আমার কানে ঢোকেনি কেন! আমি এতক্ষণ কি করছিলাম। কার কথা ভাবছিলাম! কি ভাবছিলাম! দূর কী যে ছাই হচ্ছে আজ।

আমি বইখাতা রেখে নুপু'র সামনে গিয়ে বসি। নুপু আমাকে দেখে অবাক হয়। রেওয়াজ থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিরে?

কিছু না! এমনিতেই। পড়তে ভাল্লাগছে না।

নুপু হাসে। মনে পড়েছে নাকি?

আমি অবাক হয়ে বলি, কার কথা?

আর কার কথা!

বাজে কথা বলিস না। রেয়াজ বাদ দে। একটা গান কর।

কোন গান?

কাঁদালে তুমি মোরে...

কেন খুব কাঁদাচ্ছে নাকি তোকে?

এ কথায় আমি একটু রেগে যাই। বড় বোনের গলায় বলি, তুই খুব পেকেছিস।

বারে আমি এখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি...

হয়েছে। গা।

নুপু আর কোনও কথা বলে না। গায়। কাঁদালে তুমি মোরে, ভালবাসারই ঘায়ে...

শুনে আমি আস্তেধীরে উদাস হয়ে যাই। আমাকে এখন কে কাঁদাচ্ছে? অমু না ও?

কদিন আগে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ইউনিভার্সিটিতে। আমি ক্লাসে যাচ্ছি, দেখি ও আসছে।

সেদিন আমি কি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম! হবে হয়ত। তবু ওকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। ওর চুলটুল উস্কোখুস্কো। মুখে ঢলঢলে একটা ঘুমভাব। ও কখনও রাতেরবেলা ভাল ঘুমোয় না। কাল ও কোথায় ছিল? নিশ্চয়ই মদ খেয়েছে। ওর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, কাল রাতে হলে ছিলাম।

আমি কোনও কথা বলি না। তার আগে আমি দুমিনিট আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। ও দূরে দাঁড়িয়েছিল। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তবুও আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না। উদাসভাবে চলে যাই। আমি জানি মানুষের উদাসীনতা ও সইতে পারে না। নিশ্চয়ই রেগে যাবে। যাক। আমি ওকে রাগাতেই চাই। ও আমাকে কথা দিয়ে রাখল না কেন? কদিন আগেই তো বলেছিলাম, কথা দিন আর মদ খাবেন না।

ও কথা দিয়েছিল। তারপর এত সহজেই কথা ভেঙে ফেলল। তার ওপর আমার পছন্দ করা শার্ট পরে মদ খেয়েছে। ওর কি একবারও আমার কথা মনে পড়েনি! একটু কষ্ট হয়নি!

পরদিন ওর অফিসে গিয়ে অশুদ্ধ, মিথ্যুক বলে এলাম। ওর এক বন্ধু ছিল সামনে। আমি গ্রাহ্য করিনি।

তারপর থেকেই আমার কিছু ভাল্লাগছে না। ওর সঙ্গে দেখা হয় না। কদিন হয়ে গেল। চারদিন আমার মনে হয় চার বছর। এ রকম হয় কেন। অমুর সঙ্গে আগে দেখা না হলে এরকম হত। অথচ দুমাস অমুকে দেখিনি। আমার কি আগের সেই কষ্টটা হয়!

নুপু বলল, কি ভাবছিস?

এ্যাঁ। আমি চমকে উঠি। তারপরই বুঝতে পারি অনেকক্ষণ আগে গান শেষ করে নুপু বসে আছে। আমি ম্লান হেসে বলি, যা গানটাই তো শোনা হল না। আবার গা।

আর হবে না।

নুপু হারমোনিয়াম ঠেলে রাখে। আমি এখন গোসল করব। তারপর কলেজে যাব।

আমি আনমনে বলি, যা। কাজের মেয়েটাকে বল নাস্তা দিতে। ক্ষিদে টিদে আমার নেই। তবুও বলি। নিয়ম।

নটার দিকে নুপু বেরিয়ে যায়। তারপর থেকে আমার নিজেকে বড় একা লাগে। ইউনিভার্সিটিতে যাব। গিয়ে কি করব! এক লাইনও পড়া হয়নি। পরীক্ষা দেয়া যাবে না।

তখন মনে পড়ে ও যদি এসে ইউনিভার্সিটিতে আমাকে খুঁজে যায়। তাছাড়া ওসব বলার পর ওর এখন কি অবস্থা। আমার সঙ্গে দেখা হলে কি বলবে। জানতে ইচ্ছে করে। আর এই ইচ্ছেটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা নীল শাড়ি পরে বেরিয়ে পড়ি। নীল শাড়ি ওর পছন্দ।

গোসল না করে আমি কখনও বাড়ি থেকে বেরুই না। নিজেকে বড় নোংরা লাগে, অগোছাল লাগে। আজ গোসল করতে ইচ্ছে করে না। কেন যে মনে হয়, বড় দেরি হয়ে যাবে। ও যদি এসে ফিরে যায়। তাছাড়া বুকের ভেতর একটা গোপন ইচ্ছেও খেলে যায়। ও আমাকে দেখে বুঝুক, ওসব বলার পর থেকে আমিও ভাল নেই।

ইউনিভার্সিটিতে এসে ক্লাসের দিকে যাই না। পাবলিক লাইব্রেরির সামনের বারান্দার উদাস ভঙ্গিতে বসে থাকি। ও এলে এখানে আসবেই। সামনের নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে আমি ওর কথা ভাবতে থাকি। চারদিকে অনেক ছেলেমেয়ে। দল বেঁধে বসে আছে। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে কেউ। মেয়েদের উদ্দেশ্যে রম্য কথাটথা ছুঁড়ে দিচ্ছে দু একটা মার্কামারা ছেলে। একদল মেয়ে এইমাত্র কলকল করে কথা বলতে বলতে চলে গেল। দেখেই বোঝা যায় ইউনিভার্সিটিতে নতুন। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। চালচলনে এখনও কলেজ কলেজ ভাব। আমার পাশেই অল্প দূরে বসে আছে ইংরেজিতে পড়ে সেই পেয়ারটা। রোজ এখানটায় বসে ওরা। ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে। কত যে কথা থাকে মানুষের!

মেয়েটা দেখতে বেশ। টিভিতে অভিনয় টভিনয় করে। একদিন ওকে দেখিয়ে বলেছিলাম, মেয়েটা বেশ সুন্দর না? ও সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, শাকচুন্নির মতো দেখতে।

কথাটা আমার কানে যায় না। আমি ওর সিগারেটের শেষ টান দেয়া দেখছিলাম। এই টানটাও খুব সুন্দর।

আমাকে আনমনা দেখে ও বলে, কি ভাবছ?

কিছু না।

তারপর নিজেকে সামলে বলি, মেয়েটি বেশ সুন্দর না?

বললাম তো।

কি?

শাকচুন্নির মতো।

যাঃ। আপনি মেয়েদের খুব নিন্দে করেন।

নিন্দে না। আসলে মেয়েরা মেয়েদের রূপ বোঝে না। পুরুষমানুষরা বোঝে।

হঠাৎ পেছন থেকে আমার চুল টেনে দেয়। আমি চমকে উঠি। মিনু আর তানি। দুজনের হাতেই বইখাতা।

আজকের পরীক্ষা দিলি না কেন?

পড়া হয়নি।

তাতে কি?

পড়া না হলে পরীক্ষা দিয়ে কি হবে?

তানি বলল, ভালই করেছিস। পরীক্ষা না দিস ক্লাসে তো যাবি? এখানে বসে আছিস কেন?

ভাল্লাগছে না।

মিনু বলল, অমু আসবে নাকি?

কি জানি।

তাহলে অত উদাস হয়ে কার কথা ভাবছিস?

কার কথা ভাবব, এমনিতেই বসে আছি।

তখন একটা ঈগলুঅলা আসে। আমি উদাস ভাবটা কাটানোর জন্য মিনুকে বলি, চকবার খাওয়াবি?

মিনু ভ্যানিটি ব্যাগ হাতড়ায়। দাঁড়া দেখি পয়সা আছে নাকি। তারপর সরল একটা হাসি দিয়ে বলে, খা। মেলা পয়সা আছে।

তানি বলল, এই ঈগলুঅলা, তিনটা চকবার।

চকবার কথাটা শুনেই আমার আবার ওর কথা মনে পড়ে। ওকে একদিন চকবার খাইয়েছিলাম। এসব টুকটাক খাবার ও একদম পছন্দ করে না। আচার টফি আইসক্রীম মেয়েরা যেসব জিনিসগুলো পছন্দ করে ওর সেগুলোই সবচে অপছন্দ। ও মাছও খায় না। কাটা বাছতে নাকি কষ্ট। শুনে আমি হেসে মরি। তারপর মনে মনে বলি, তোমাকে একদিন মাছের কাটা বেছে হাতে তুলে ভাত খাইয়ে দেব। দেখবে মাছের কি স্বাদ। কিন্তু চকবার

খেতে গিয়ে ও সেদিন যা করেছিল না। মুখটুখ একেবারে মেখে ফেলেছিল। তারপর যখন চকবারটার অর্ধেকটা আছে, কামড় দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো জিনিসটা ভেঙ্গে পড়ে গেল। ও বলল, যা!

আমি খিলখিল করে হেসে উঠি। তখুনি ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোমার দেয়া কোনও জিনিস বোধহয় আমার পুরোপুরি নেয়া হবে না।

শুনে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। মনে মনে বলি, তুমি এত দেরি করে এলে কেন? আমি যে অনেক কাল তোমার অপেক্ষায় থেকে, তারপর অন্যজনকে...

কিন্তু মুখে ওকে আমি কখনও অমুর কথা বলিনি। একটা ভয়, ও যদি তারপর আমার সঙ্গে আর দেখা না করে। সাংঘাতিক জেদী মানুষ। হয়ত সারাজীবন আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না। সে আমার বড় কষ্ট। ওকে না দেখে আমি থাকব কেমন করে।

চকবার খাওয়া শেষ হয়নি হঠাৎ দেখি অমু আসছে। সেই নরম ভঙ্গিতে, মাথা নিচু করে। হাতে সিগারেট জ্বলছে। দূর থেকেই দেখি অমুকে আজ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। পরেছে ধবধবে সাদা বিদেশি শার্ট, খয়েরি রংয়ের প্যান্ট। অমু সব সময় শার্ট ইন করে পরে। আজও পরেছে। অমুকে আজ দারুণ স্মার্ট লাগছে। নতুন চাকরি পেয়ে কি অমু নিজেকে নতুন করে সাজাচ্ছে!

অমুকে দেখে মিনু বলে, ভেতরে ভেতরে খবর দেয়া ছিল। আর তুই এতক্ষণ আমাদের কাছে লুকোলি?

আমি কথা বলি না। তানি এগিয়ে গিয়ে দুহাত নত করে, পুরনো কালের রাজা-বাদশাদের বিনীত সভাসদরা যেভাবে 'আসুন মহারাজ' বা এ ধরনের কথা বলত, ঠিক সেভাবে রিসিভ করে। আসুন, রাণী আপনার অপেক্ষায়।

অমুর কথা তো সারা পৃথিবী জানে। আমার দু একজন ছেলে বন্ধু, যেমন কাজল, সে তো অমুকে সরাসরি দুলাভাই ডাকে। আর আমার সঙ্গে কাজলের পরিচয়ের পর থেকেই সে আমাকে ডাকে ছোটপা বলে।

কিন্তু অমুকে দেখে আমি কি ভেতরে ভেতরে খুব খুশি হয়ে উঠি। ঠিক বুঝতে পারি না। মনে প্রাণে আজ তো একবারও আমি অমুর কথা ভাবিনি। অমুর সঙ্গে দেখা হোক, চাইনি। আজ তো আমার ঘুম ভেঙ্গেই ওর কথা মনে পড়েছে। কিন্তু ও এল না। এল অমু। ব্যাপারটা উলটো হয়ে গেল। এমন তো হওয়ার কথা না। অনেকদিন ঘুম ভেঙ্গে আমার অমুর কথা মনে পড়েছে। ভেবেছি আজ অমুর সঙ্গে দেখা হবে। হয়নি। কখনও হয়নি। কিন্তু ওর কথা

যেদিন মনে পড়েছে, কিংবা ওর কথা ভেবেছি, খুব বেশি ভেবেছি, সেদিন ঠিক ঠিক ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। হয় ও ইউনিভার্সিটিতে এসেছে, নয় সরাসরি বাসায়। এক দিনের কথা মনে আছে। তিরিশে এপ্রিল। দুপুরবেলা ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে খুব টায়ার্ড লাগছিল। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তেই ঘুম। ভাঙে একদম ছটা বাজিয়ে। তাও আমার খালাত বোন লিলি এসে ডেকে তোলে।

ঘুম ভাঙার পর আমি লিলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। খানিকক্ষণ লিলিকে চিনতে পারি না। কেন যে মনে হয় ঘুমের ভেতর থেকে আসলে ও আমাকে ডেকেছে। অনেকবার ডেকেছে। সেই ডাকেই আমি জেগেছি।

বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠে। আজ যদি ওকে একবার দেখতে পেতাম।

মনে মনে আমি তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনবার ওকে ডাকি। চলে এস, চলে এস, চলে এস।

সন্ধেবেলা লিলি জোর করে আমাকে নিউমার্কেটে নিয়ে যায়। ওর কি কি সব কেনাকাটা আছে। যে কোনও কিছু কিনতে হলেই লিলি চলে আসে আমাদের বাসায়। আমি সঙ্গে না থাকলে লিলির কিছু কেনা হয় না।

কিন্তু সেদিন আমার একদম যেতে ইচ্ছে করে না। মনে মনে আমি ওর অপেক্ষায় আছি। তিনবার ডেকেছি, ও নিশ্চয় আসবে। এসে যদি আমাকে না পেয়ে ফিরে যায়! আর আমি যদি ফিরে এসে শুনি ও এসে আমাকে না পেয়ে চলে গেছে তাহলে যে আমার ঘুম হবে না। কান্না পাবে।

আমি লিলিকে অনেক করে বোঝাই। লিলি আজ থাক। আমার শরীরটা ভাল নেই। কাল যাব।

লিলি কিছুতেই রাজি হয় না। চল না, এক ঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসব। তোকে নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব বাসায়।

এরপর আর কি বলা যায়। শাড়ি পালটে আমি লিলির সঙ্গে বেরোই।

রিকশায় চড়ার সময় মনে মনে বলি, অপেক্ষা কর, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কর।

নিউমার্কেটে গিয়ে আমার যে কি তাড়াহুড়ো!

লিলি অবাক হয়ে যায়। তুই এমন করছিস কেন?

ততক্ষণে লিলির জিনিসপত্রগুলো কেনা হয়ে গেছে। জানি এখন লিলি ঢুকবে নোবেল ড্রিংকসে। তারপর আইসক্রিম খাওয়া। আমি বললাম, আজ ওসব বাদ দে। আমি বাসায় ফিরব।

নিউমার্কেটে এসে কিছু না খেয়ে যাব?

আর একদিন আসা যাবে। চল তো।

আমি তখন কল্পনায় দেখছি ও এসে আমাদের বসার ঘরে, বেতের চেয়ারটায় মাথা নিচু করে বসে আছে। হাতে সিগারেট।

বাড়ি ফিরে হুবহু ঐ দৃশ্যটা দেখি। ও ঠিক বসে আছে ঐ চেয়ারটায়। মাথা নিচু করে কি ভাবছে আর সিগারেট টানছে। দেখে আমার যে কী হয়ে যায়। একেবারে ওর গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াই। আমি জানতাম, আপনি আজ আসবেন।

ও উদাস চোখ তুলে তাকাল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠি। চোখ দুটো একদম বসে গেছে। গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে চোখের কোলে। ও কি রাতেরবেলা ঘুমোয় না? কেন, কি হয়েছে ওর! ঘুমোয় না কেন?

আমার সব জানতে ইচ্ছে করে। আর ইচ্ছে করে ওর গলা জড়িয়ে গাঢ় করে চুমু খেয়ে দিই দুচোখে। ওর চোখের সব কালিমা নিয়ে নিই আমার ঠোঁটে।

অমু আমার পাশে বসার আগে ঠাণ্ডা মেঝেতে ফুঁ দিয়ে পাতলা ধুলো সরিয়ে নেয়। ব্যাপারটা আমার চোখে লাগে। অমু বোধহয় আরও দু একবার এ রকম করেছে।

আমার চোখে লাগেনি। আজ লাগল কেন!

আসলে অমুকে দুমাস দেখি না। এই দুমাস শুধু ওকে দেখেছি। ওর এসব অভ্যেস নেই। ও যেখানে সেখানে অবলীলায় বসে পড়ে। জামাকাপড় পরে খুব দামী দামী। গেঞ্জি শার্ট মিলিয়ে ওর যে কতগুলো আছে, কে জানে। যেদিনই ওর সঙ্গে দেখা হয় সেদিনই দেখি নতুন শার্ট কিংবা গেঞ্জি পরা। আর ও বোধহয় এক কাপড় পর পর দুদিন পরে না।

অমু আমার পাশে বসে বলল, কখন এসেছ?

আমি উদাস চোখে অমুকে দেখছিলাম। আর একটা ব্যাপার টের পাচ্ছিলাম, আগে অমু এসে আমার পাশে বসলেই অমুর গায়ের গন্ধ আর অন্যান্য সবকিছু মিলিয়ে কি যে এক আবেশের ভেতর নিয়ে যেত আমাকে। বুকের ভেতর তিরতির করে বইতো সুখী একটা হাওয়া। আজ ওরকম কিছু হচ্ছে না। কেন ওর প্রতীক্ষায় ছিলাম বলে আমার এ রকম হচ্ছে। অমুকে কি আমি সহ্য করতে পারছি না! এ আসলে অন্যায়। অমুকে দুঃখ দেয়া। অমুর অপরাধ কি! অমুকে আমি দুঃখ দেব কেন!

ওর চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আমি বলি, অনেকক্ষণ।

তারপর অমুর মুখের দিকে আবার তাকিয়ে থাকি। মিনু বলে, আপনি যে আসবেন, কথাটা নদী এতক্ষণ চেপে রেখেছে।

অমু মৃদু হাসে। কথা বলে না। ওর এই এক স্বভাব, কথা খুব কম বলে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অমু সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে। দেখে আমি চোখ ফেরাই। অমুর শেষ টানটা ওর মতো সুন্দর হয় না। তানি আমার পাশে বসে, বইখাতাগুলো কোলের উপর রেখে বলল, নদী সকাল থেকে আপনার জন্য বসে আছে। ক্লাস করেনি। আমাদের কাছে আপনার কথাটা সরাসরি এভয়েড করল।

অমু তবু কথা বলে না।

মিনু বলল, একটা কিছু বলুন।

অমু হাসে। সঙ্গে মিনু আর তানিও।

আমার হাসি পায় না। হায়, ওরা জানে না আমি অমুর জন্য অপেক্ষা করছি না। করছি ওর জন্য। ও এল না এল অমু। অমুও কথাটা বলছে না। বলেই বা কি করবে, ওরা বিশ্বাস করবে না।

আমি মিনু আর তানিকে এতক্ষণে খেয়াল করে দেখি।

মিনু পরেছে শাড়ি। চওড়া লাল জরির পাড়। সাদা শাড়িতে মিনুকে খুব মানায়। আর তানি পরেছে হলুদ কাজ করা পাঞ্জাবী। সঙ্গে গাঢ় নীল জিনসের প্যান্ট। তানির চোখ দুটো বসা বসা। ওকে দেখে আমার সব সময় মনে হয় তানি রাতেরবেলা ঘুমোয় না। এই না ঘুমোনো ভাবটা তানির চেহারায় আলাদা একটা সৌন্দর্য এনে দেয়। ডালিম নাকি তানির এই জিনিসটাকেই সবচে বেশি পছন্দ করে।

তানি বলল, আপনার সুখবরটা পেয়েছি।

অমু অবাক গলায় বলল, কিসের সুখবর?

নতুন চাকরি।

মিনু বলল, আমাদের চাইনিজটা কবে হবে?

যেদিন বল।

আজই হোক না।

তানি বলল, বহুদিন চাইনিজ খাই না।

অমু বলল, ঠিক আছে। চল। তারপর আমার মুখের দিকে তাকায়। চল।

আমি বলি, আমার ভাল্লাগছে না। আজ বাদ দাও।

এ কথায় মিনু বেশ রাগ করে। অমুর দিকে তাকিয়ে বলে, আসলে ও চায় না আমরা সঙ্গে থেকে ওর ডিস্টার্ব করি।

তানি বলে, তাই। ওকে একটু কথাটথা বলার চান্স দিতে হয়। ঠিক আছে, যাচ্ছি না বাবা।

শুনে আমার যে কি রাগ হয়। মিনুর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাই।

ভাল হচ্ছে না কিন্তু। তোরা থাকলে আমার ডিস্টার্ব হবে জেনে এখনও বসে আছিস কেন? চলে যা না।

মিনু কথা বলে না। বলে তানি, ঠিক আছে এক ঘণ্টা সময় দিলাম।

কথাটথা যা আছে বলে নাও। আমরা হলে যাচ্ছি। ঠিক এক ঘণ্টা পরে আসব। তারপর, ওহ আজ দুপুরের খাওয়াটা যা হবে না!

মিনু আর তানি দুজনে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠে। ওদের কীর্তিকলাপ দেখে অমু হাসে। আমার হাসি পায় না। তিন বছর ধরে একরকমই দেখছি। রোজ রোজ এক রকমের দৃশ্য দেখে কি হাসি পায়।

মিনু আর তানি চলে যেতে যেতে অমুর দিকে তাকায়। কথা ঠিক থাকে যেন। আমরা একঘণ্টা পর আসছি।

তানি বলল, নায়িকা নিয়ে আবার কেটে পড়বেন না, খবরদার।

অমু হাসে। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকি। আজ অমুর বেশ খসবে।

ওরা চলে যেতেই অমু গাঢ় চোখে আমার দিকে তাকায়। কেমন আছ? শুনে এই প্রথম আমার ভেতরে মৃদু একটা অভিমান টলমল করে ওঠে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলি, আমার ভাল থাকা না থাকায় তোমার কী এসে যায়?

অমু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, দুটো মাস সাংঘাতিক ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া নতুন অফিসে...

হয়েছে, আমি কারও কাছে কৈফিয়ত চাইনি।

অমু কথা বলে না। আমি এই ফাঁকে আর একবার ওর কথা ভেবে নিই। আমি এত করে ভাবলাম তবুও ও এল না। কেন এল না! ওকে কি আমি সত্যিকারভাবে ডাকিনি! এ জন্যই কি ও এল না! এল অমু।

একদিন আমি আমার খাতায় আনমনে লিখেছিলাম, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে। আজ এস।

সেদিন ও ঠিকই এসেছিল। আমি খাতাটা খুলে ওরে চোখের উপর ধরেছিলাম। আজই লিখেছি।

ও ম্লান হেসে বলল, এর নাম টেলিপ্যাথি। তারপরই আনমনে হয়ে গেল।

আমি বললাম, কি ভাবছেন?

তুমি কি আমাকে কখনও 'তুমি' করে বলবে?

শুনে আমি কোনও কথা বলি না। এক পলক ওর দিকে তাকিয়ে নখ খুঁটতে থাকি। কাজের মেয়েটা তখন চা দেয়। ও চায়ে চুমুক দিতে যাবে ঠিক তখুনি পর্দা সরিয়ে মা এ ঘরে উঁকি দেয়। আমি থতমত খেয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। আমার মা। ও উঠে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে মাকে সালাম করে। মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বেঁচে থাক বাবা।

তারপর চলে যায়।

চায়ে চুমুক দিয়ে ও একবার আমার দিকে তাকায়। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। টানতে টানতে আনমনা হয়ে যায়। সেদিন চলে যাওয়ার আগে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও আমাকে বলেছিল, তুমি আমাকে একদিন তুমি করে বল।

আমি কথা বলিনি।

সেদিন সারারাত মনে মনে কতবার যে ওকে আমি তুমি করে বলেছি!

অমু বলল, কি ভাবছ?

এ্যাঁ, আমি চমকে উঠি।

অমু হাসে। তুমি বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছ কেন?

কই? আমি মৃদু হাসি। তারপর মনে মনে নিজেকে একটু শাসন করি। এ আমার অন্যায়, সত্যি অন্যায়। অমুর পাশে বসে আমি একবারও ওর কথা ভাবব না!

তখুনি, ঠিক তখুনি দেখি সামনের আম আর নিমের পাতলা ছায়া ভেঙে ও আসছে। পরনে নীল জিনসের প্যান্ট আর ফুলহাতা নীল জিনসের শার্ট। বাঁ হাতে সাদা শিকল বাঁধা। এই জিনিসটা দেখে আমি একদিন বলেছিলাম, আপনি এটা কি পরেন? ঘড়ি পরতে পারেন না?

শুনে ও হেসেছিল। ঘড়ি পরে কি হবে? আমি তো সব জায়গায়ই লেট।

কি রকম?

আমার সব জায়গায় একটু দেরি করে পৌঁছানো হয়। নয়ত তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেককাল আগে দেখা হওয়ার কথা ছিল।

দেখা হলে কি হত?

কিছু একটা তো হত, যা এখন হবে না।

কি করে বুঝলেন?

তোমাকে দেখেই মনে হয় তুমি আসলে আমার নও, অন্য কারও। শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। ও কি অমুর কথা জানে! কিছু শুনেছে?

কিন্তু কার কাছে শুনবে! আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছাড়া আর আমাদের বাড়ির লোকজন ছাড়া অমুর কথা কেউ জানে না। আমার বন্ধুদের সঙ্গে তো ওর আলাপই নেই! তাহলে!

চুপ করে এসব ভাবি। তারপর মনে মনে চেঁচিয়ে বলি, তুমি এত লেট কেন, এত লেট কেন?

ওকে দেখে কখন যে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, বুঝতে পারিনি। আমার দেখাদেখি অমুও উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, নদী, কি হল? তখন আমি আস্তে করে নিজেকে সামলে নিই। ওকে দেখে আমার যে কি ভাল লাগছে! ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরি। তোমার জন্যে সেই সকাল থেকে অপেক্ষা করছি। এত দেরি করলে কেন?

আমার পাশে অমুকে দেখে ও কি একটু চমকায়? আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

সামনে এসে ও একটু ম্লান হাসে। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। সেই ফাঁকে আমি খেয়াল করি ওর মুখে তিন চারদিনের দাড়ি গোঁফ, চেহারাটা বেশ ভাঙা। জামা কাপড়ে নোংরা। ও এক জামা দুদিন পরে না। কিন্তু ওর আজকের জামা কাপড় দেখে মনে হয় তিন চারদিন ধরে পরে আছে। এই জামা কাপড় পরেই ঘুমিয়েছে। কি হয়েছে ওর! অশুদ্ধ বলায়, মিথ্যুক বলায় ও খুব কষ্ট পেয়েছে।

কথাটা ভেবে আমার ভেতর সেই গুমোট রাগটা আবার নড়েচড়ে ওঠে। ও কি আবার মদ খেয়েছে। থাক আমার কি! ও আমার কে, আমি ওর কে! আমার সব অমু। অমুর সব আমি।

এরপর আমি খুব ধীরভাবে অমুর দিকে তাকাই। এস, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

শুনে ও কি আবার চমকায়!

আমি খেয়াল করি না। ওরা ততক্ষণে দুজন দুজনের হাত ধরেছে। সেই ফাঁকে আমি ওদের দুজনকে মিলিয়ে দেখি। ওদের মধ্যে কে বেশি সুন্দর। অমুই।

দেখে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। এই দীর্ঘশ্বাস কার জন্য! অমুর না ওর। বুঝতে পারি না।

মিনু আর তানি আসার আগেই ও চলে গেল। যাওয়ার আগে কী রকম করুণ চোখে যে একবার আমার দিকে তাকায়। দেখে আমার বুকের

ভেতরটা হু হু করে ওঠে। আমি কি ওকে আবার একটা দুঃখ দিলাম। অমুর সঙ্গে কেন ওর পরিচয় করিয়ে দিতে গেলাম! হায়, এ আমি কি করলাম! ও যদি আমার সঙ্গে আর দেখা না করে! কথা না বলে!

আমার ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরে টেনে আনি। ওর বুকের কাছে মুখ রেখে বলি, অমু আমার কেউ নয়। আমার সব তুমি। শুধু তুমি।

অমু বলল, ভদ্রলোককে নিয়ে গেলেই পারতে।

আমি বোকার মতো বলি, কোথায়?

চাইনিজ খেতে।

ও।

তারপর একটু থেমে বলি, ও যেত না।

কেন?

তোমার সঙ্গে আজই প্রথম পরিচয়। বললেই চাইনিজ খেতে চলে যাবে?

অমু একটু থেমে বলে, লোকটা কে?

লোকটা না, বল ছেলেটা।

অমু হাসে।

আমি বলি, আমার পরিচিত।

অমু কথা বলে না। দেখে আমি একটু অবাক হই। বলি, জিজ্ঞেস করলে না, কেমন পরিচিত?

জিজ্ঞেস করার কি আছে?

যদি তোমার মতোই আমার কেউ হয়?

যাঃ! তা কি করে হয়। আমি তো জানি তুমি আমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পার না।

শুনে আমার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মনে মনে বলি, তুমি জান না। তুমি কিচ্ছু জান না। ও যে আমার কে, সে তুমি বুঝবে না।

আমি

চারদিন বাড়ি ফিরি না। সেদিন রাতেরবেলা মাতাল হয়ে গেটের কাছে শুয়েছিলাম, ঘুম ভেঙেছে আজানের সঙ্গে সঙ্গে। ঝাৎ করে ঘুমটা কেটে গেছে। তারপর লাফিয়ে উঠেছি। একে একে সব মনে পড়েছে। মার ওপর রাগটা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ফিরব না, আর কখনও আমি ফিরব না।

সেই সকালে উঠেই রিকশা নিয়ে চলে এসেছি মুহসিন হলে দিদারের রুমে। তার আগে নিউমার্কেটের মোড়ের একটা দোকান থেকে মুখে খানিকটা জল দিয়ে নাস্তাটা সেরে নিয়েছি। ভীষণ খিদে পেয়েছিল। কাল রাতে কিছু খাইনি।

দিদারের ঘুম ভাঙে নটার দিকে। সকালবেলার ক্লাশগুলো ও মিস করে। আমার তো ক্লাস ফ্লাসের ব্যাপার নেই। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছি কবে।

সাড়ে সাতটার দিকে হলে গিয়ে দিদারের ঘুম ভাঙাই। চারতলায় সিঙ্গেল সিটেড রুম নিয়ে দিদার থাকে।

আমার ডাকাডাকিতে চোখ কচলাতে কচলাতে বিরক্ত হয়ে দিদার ওঠে। কিরে, এত সকালে কোত্থেকে এলি?

আমি কথা না বলে ঘরে ঢুকি। দিদারের রুমটা খুব নোংরা হয়ে আছে। সিগারেটের ছাই আর টুকরোয় মেঝেটা কদাকার। বিছানাটা দলাই মলাই হয়ে আছে। দুটো বালিশের একটা ফেটে পাতলা তুলো ছড়িয়ে আছে। দিদারের খালি গায়ে লোমের মতন লেগে আছে তুলো। সেই অবস্থায় দিদার আবার গিয়ে বিছানায় শোয়।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান খেয়ে দিদারের ঠোঁটে গুঁজে দিই। খা।

তারপর চেয়ারের ওপর গাদা করে রাখা কাপড় চোপড়ের ভেতর থেকে একটা ময়লা লুঙ্গি বের করে জামাকাপড় ছাড়ি। গোসলটা সেরে নেয়া উচিত।

সাওয়ারের তলায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে নিজেকে বেশ ফ্রেস লাগে। পাতলা গামছায় শরীর মুছতে মুছতে টের পাই মাথাটা কেমন ভার ভার। এক ধরনের অস্বস্তি হচ্ছে। হ্যাংওভার। কোয়ার্টার প্যাগ নীট হুইস্কি খেতে পারলে কেটে যেত। পাব কোথায়?

রুমে ফিরে দেখি দিদার উঠে বিছানাটা টেনেটুনে ঠিক করেছে। বালিশ দুটো রেখেছে সাজিয়ে। নিজ হাতে ঝাড়ন দিয়ে মেঝেটাও তকতকে করে ফেলেছে। দেখে আমার ভারি আহলাদ হয়। দিদারকে জড়িয়ে ধরে টুক করে ওর বাসি গালে একটা চুমু খাই।

দিদার অবাক হয়ে বলে, তোর কেসটা কি?

কিছু না। কদিন তোর এখানে থাকব।

থাক। বহুদিন একলা হয়ে আছি।

তখন আমি প্যান্ট পরতে পরতে বলি, কোনও অসুবিধা হবে না তো?

দিদার চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকায়। পাছায় লাথি মেরে বের করে দেব শালা।

আমি আর কথা বলতে সাহস পাই না। খালি গায়ে প্যান্ট পরা আরামসে বিছানায় গিয়ে শুই। একটা সিরিয়াস ঘুম চাই। নয়তো হ্যাংওভারটা কাটবে না।

দিদার বাথরুমে যাবে, আমি জিজ্ঞেস করি, তোর ক্লাস নেই?

আছে। সাড়ে আটটায়।

তুই সকালবেলার ক্লাস করিস?

আজ করব।

আমি ঘুমোব, দুনম্বর চাবিটা দিয়ে যাস।

আচ্ছা।

আমার তখন চকিতে নদীর কথা মনে পড়ে। নদীর সঙ্গে কি আজ দেখা করব! না। আমাকে দেখলেই নদী সব বুঝে যাবে। আমি নদীকে আর কষ্ট দিতে চাই না।

দিদার ফিরে এসে বলল, তুই অফিসে যাবি না?

না।

বাসায় কি করছিস?

কিছু করিনি। এমনি।

আমার তখন একটু একটু চোখ টানছে। সেই অবস্থায় দেখি দিদার শার্ট প্যান্ট পরে মাথায় আচড়াচ্ছে। কি আশ্চর্য। ঐ ঘোরের ভেতর আমি আবিষ্কার করে ফেলি দিদারের কোথায় যেন এক ধরনের ঋজুতা আছে, এক ধরনের অহংকার। এই ধরনের ছেলেদের বোধহয় মেয়েরা খুব পছন্দ করে। আমি যদি দিদার হতাম।

চলে যাওয়ার আগে চাবির সঙ্গে দিদার আমাকে আর একটা জিনিস দিয়ে যায়, ছোট্ট একটা টেপ রেকর্ডার। গোটা তিনেক ক্যাসেট।

জিনিসটা দেখে আমার ঘুম ভাবটা কেটে যায়। কার্টুন স্টাইলে তরাক করে লাফিয়ে উঠি। কবে কিনেছিস দোস্ত?

কদিন আগে।

তারপর দিদার টেপ রেকর্ডারের সুইস টুইস লাগিয়ে, একটা রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট চাপিয়ে বেরিয়ে যায়।

আমি আবার একটা সিগারেট ধরাই। তারপর শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানি আর ক্যাসেটে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকি। নির্জনতায় বোধহয় রবীন্দ্রনাথের গান অন্যরকম হয়ে যায়। কত রকমের যে মানে বেরোয় এক একটা লাইন থেকে। যেমন শেষ গানটা 'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না'র এক জায়গায় আছে 'এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়' শুনে আমার মনে হয় এই লাইনটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেয়েদের কথা চিন্তা করে লিখেছিলেন। গানটা পর পর সাতবার শুনি।

এইভাবে পুরো দুটো দিন কাটে। এই দুদিন অফিসে যাইনি। নদীর কথা ভাবিনি, বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা ভাবিনি।

দুদিন পর দুপুরবেলা হল থেকে বেরিয়ে রিকশায় চড়ে মনে হয় দুদিন পৃথিবী থেকে বাইরে চলে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরে এসেছি। কিন্তু এখন আমি কোথায় যাব! কার কাছে যাব! ঢাকা শহরে আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

নদীর কাছে যাব?

নদী এখন কি করছে? এই দুপুরবেলা। ঘুমুচ্ছে, না জানালায় দাঁড়িয়ে দূরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে?

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখের ভেতর থেকে দেখতে থাকি,

জানালায় বসে নদী উদাস চোখে তাকিয়ে আছে দূরের রাস্তার দিকে। নদীর একগোছা চুল এসে পড়েছে কপালের ওপর। নদী খেয়াল করছে না। ওর চেহারায় এক ধরনের কোমল বিষণ্ণতা।

নদীকে কি হুবহু এভাবে কখনও দেখেছিলাম! ঐ দৃশ্যটাই চোখের ভেতর মাইক্রোফিল্ম হয়ে আছে। চোখ দিয়ে দেখা যে কোনও দৃশ্যই কি চোখের ভেতর রয়ে যায়! জানি না! তাহলে নদীকে এভাবে ভাবছি কেন? পুরুষমানুষরা কী এভাবে মেয়েদের কথা ভাবে, ছবি দেখে। কোনও নায়ক কি কোনও নায়িকাকে ঠিক এইভাবে!

আমার সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। রিকশা নিয়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়াই। তারপর বিকেলবেলা বাংলাবাজার, গোবিন্দপালের দোকানে যাই। রতন, মাসুদ আর রহমান একদিন মদ খেতে চেয়েছিল।

আজ ওদেরকে খাইয়ে দেব। কেন যে মনে হয় ওদের সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না।

কিন্তু গোবিন্দপালের দোকানে ঢুকেই আমি চমকে উঠি। তারপর বুকের ভেতরটা বহুকাল পর কী যে এক আনন্দে নেচে ওঠে। রতনদের সঙ্গে বসে আছে রায়হান। রায়হান আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা এক সঙ্গে স্কুলে তারপর কলেজে পড়েছি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে রায়হান জার্মানিতে চলে যায়। তারপর তিন বছর রায়হানের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ ছিল না। রায়হান কোনও বন্ধু বান্ধবের কাছে চিঠি লেখেনি। প্রথম প্রথম আমি দুচারটে লিখেছিলাম। রায়হান জবাব দেয়নি। অথচ ওর জন্য আমি...

ওসব কথা পরে বলব।

আমাকে দেখেই রায়হান লাফিয়ে উঠল। তারপর পাগলের মতন রতনের চেয়ার ঠেলে ছুটে এল। এসেই দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল, দোস্ত, কেমন আছিস?

আমি খানিকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারি না। আবেগ গলা চেপে রাখে। দুহাতে রায়হানকে জড়িয়ে রাখি। চলে যাওয়ার দিন এয়ারপোর্টে রায়হান ঠিক এভাবে আমাকে বহুক্ষণ বুকে জড়িয়ে রেখেছিল।

রায়হানের চলে যাওয়াটা ছিল আচমকা। ঝড়ের মতো। তিন বছর আগে একদিন দুপুরবেলা আমি একটা অদ্ভুত টেলিফোন পেয়েছিলাম। একটা অচেনা মেয়ে, গলা শুনে মনে হয়েছিল কোথায় যেন শুনেছি। চিনতে পারিনি। টেলিফোনে আমাকে শুধু একটা কথাই বলেছিল, বিকেলবেলা

এয়ারপোর্টে যাবেন। আমি খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। বারবার মৃত টেলিফোনে তারপর হ্যালো হ্যালো করেছি। আপনি কে, আপনি কে?

কেউ জবাব দেয়নি।

তারপর কতভাবে যে কথাটা ভেবেছি। কে টেলিফোন করেছিল? কেন এয়ারপোর্টে যেতে বলল? ট্র্যাপ না তো!

তবুও এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি রায়হান। কাঁধে ব্যাগ, দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই বলল, দোস্ত আমি জার্মানি যাচ্ছি। কাউকে বলিনি।

সত্যি রায়হানকে কেউ সি অফ করতে যায়নি। রায়হান এভাবে পালিয়ে যাচ্ছে কেন? ওর দুঃখটা কি?

এসবের পরও রায়হানের ওপর তীব্র অভিমান হয়েছে। কাউকে না বলুক আমাকে তো বলবে। ওর জন্য আমি...

রায়হান আমার হাত ধরে পাশের চেয়ারে বসাল। তারপর চিৎকার করে বলল, এক কাপ চা।

আমার তখন মুখে কথা আসছে না। আচমকা আনন্দে মানুষের কি কথা বন্ধ হয়ে যায়!

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বলি, কবে এসেছিস?

তিনদিন হল।

একবারও আমার খোঁজ নিলি না?

তোদের বাসায় গিয়েছিলাম। তুই নাকি...

আমি তিন চারদিন বাসায় যাই না।

রায়হান কিছু বলার আগে রতন বলল, তোকে বাসায় যেতে কে বলে শালা! আমাদের বারবার ফিরে যেতে হয়। বেকার। থাকা খাওয়ার জায়গা নেই। বাড়ি না ফিরে কি করব? তুই শালা হেভি মাল কামাচ্ছিস। আলাদা বাসা ভাড়া কর। আমরা রেগুলার আড্ডা দেব। মাল খাব।

রহমান বলল, এ্যাঁ, শালার আহ্লাদ দেখ।

শুনে রায়হান গলা খুলে হাসে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, তোর চাকরি বাকরির কথা শুনলাম। কোথায়?

এই শালাদের কাছে।

মাসুদ বলল, দোস্ত, জার্মানে এই তিন বছরে কতবার শালা টালা বলেছিস রে?

রোজ কমপক্ষে দশবার। ও শালারা কি আর বাংলা গাল বোঝে রে। মাকে বোনকে তুলেও কত গাল দিয়েছি।

জোরে?

হ্যাঁ, শালারা হাসতো। কখনও জিজ্ঞেস করতো কি বলছ। তখন বোঝাতাম অন্য কথা।

কি রকম?

কত রকম। একদিন একটা মেয়েকে বললাম তোমাকে... (যৌন ইঙ্গিত)। মেয়েটা বলল, মানে কি? আমি জার্মান ভাষায় তর্জমা করে বলি মানে হচ্ছে গিয়ে তোমাকে ভালবাসি। মেয়েটা শালা এত হারামী একবার শুনেই শব্দটা মুখস্ত করে ফেলেছিল। আমরা এক জায়গায় কাজ করতাম। পরদিন দেখা হতেই ভারি একটা আহ্লাদি হাসি হেসে বলল ঠোমাকে...।

শুনে আমার সেকি অবস্থা। কোনও মেয়ে যদি তোকে ঐ কথা বলে, ভাব একবার, কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে না?

শুনে আমরা গলা খুলে হেসে উঠি। খানিক হেসে সবাই থেমে যায়। আমার হাসি আর থামতে চায় না। মনে হয় বহুকাল হাসিনি। জন্মের পর এই প্রথম প্রাণ খুলে হাসছি। রায়হান শালা ঠিক আগের মতো রয়ে গেছে। স্কুলে যেমন ছিল কলেজে যেমন ছিল ঠিক যে রকম। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কখনও বদলায় না। রায়হান ঐ রকম।

চা খেতে খেতে রায়হান বলল, তোর খবর টবর কি দোস্ত!

আমি রায়হানকে দেখছিলাম। রায়হানের স্বাস্থ্য-টাস্থ বেশ ভাল হয়ে গেছে। গায়ের রঙ ফর্সা হয়েছে অনেক। চেহারায় টলটল করছে উজ্জ্বলতা। রায়হান আগে খুব সাদামাটা ছিল। এখন রায়হানকে দেখে যে কোনও মেয়েও মুগ্ধ চোখে তাকাবে।

রায়হানের দিকে তাকিয়ে থেকেই আমি বলি, আমার কোনও নতুন খবর নেই।

চাকরি করছিস এটা নতুন খবর নয়?

এই খবরটা তো তুই শুনেছিস।

তবুও আরও কত রকমের খবর থাকে না মানুষের।

আমার নেই।

প্রেম ফ্রেম?

হয়নি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের ভেতর মুচড়ে ওঠে। নদীর কথা মনে পড়ে। যখন তখন নদীর কথা আমার মনে পড়ে। কষ্ট হয়। নদীকে দেখার

জন্য বুকের ভেতর একত্রে ছটফট করে ওঠে একশটা পায়রা। নদীকে দেখার জন্য যে কোনও মুহূর্তে আমি দৌড়ে যেতে পারি একশ মাইল পথ। এই আকর্ষণের নাম কি? প্রেম? নদীর কথা রায়হানকে বলা যাবে না। কাউকে বলা যাবে না। কেবল নিজের বুকের ভেতর নদীকে রেখে নির্জনে একাকী দেখা যায়। আর কেউ দেখতে পাবে না, কেউ না। অথচ রায়হান...

ওসব কথা পরে বলব।

রায়হান বলল, তুই বাসায় যাস না কেন?

ভাল্লাগে না।

এই বয়সেও এসব!

আমার চিরকালই এ রকম থাকবে।

মনে আছে, কি এক কথায় আমার রুম থেকে রাত দুটোর সময় উঠে তুই বাসায় চলে গিয়েছিলি!

আমি ওরকমই।

কথাটা কি একটু ভারি শোনায়? রায়হান আমার মুখের দিকে তাকায়। তারপর হেসে ফেলে। হাসতেই রায়হানের সুন্দর দাঁত আমার চোখে পড়ে। সুন্দর দাঁত দেখলেই আমি লোভী চোখে তাকাই। আমার যদি ওরকম দাঁত হতো!

আমার দাঁতগুলো নষ্ট। পোকা কাটা। ওপরের পাটির মাড়ির দুটো দাঁত পোকায় খেয়েছে। ভেঙেচুরে শুধু গোড়া দুটো আছে। নিচের মাড়িতে দাঁত নেই। ভেঙেচুরে টুকরোটাকরা রয়ে গেছে। সামনের দাঁতে পোকা লেগেছিল। ফুটো হয়ে গেছে। প্লাস্টার করিয়েছিলাম। অর্ধেকটা প্লাস্টার ভেঙে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। এই কারণে মেয়েদের সামনে দাঁত বের করে হাসতে আমার খারাপ লাগে। দাঁতের জন্যই কি কেউ আমায় ঠিকঠাক ভালবাসতে পারল না! আমার জন্যে নিরালায় বসে, গভীর রাতে ঘুম ভেঙে কষ্ট পেল না কোনও মেয়ে! হায় দাঁত তুমি আমায় এ কেমন দুঃখের ভেতর রেখে দিলে!

রায়হান বলল, চল উঠি।

কোথায় যাবি?

চল না।

কটা বাজে?

রায়হান ইলেকট্রনিক্সের সিকো ঘড়ি দেখে বলল, দশটা তেইশ মিনিট বাহান্ন সেকেন্ড।

ইলেকট্রনিক্সের ঘড়িতে ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড সব লেখা হয়ে যায়। রহমান মাসুদদের মদ খাওয়াব ভেবেছিলাম। রায়হানকে দেখে সব ভুলে গেছি। রায়হান ড্রিংকস ট্রিংকস পছন্দ করে না।

রাস্তায় নেমে রায়হান বলল, আজ আমার ওখানে থাক। তোর সঙ্গে কথা আছে।

তোর বাবা কই?

দেশে গেছে।

তুই যাবি না?

বাবা এলেই যাব। মা ভাইবোনগুলোর সঙ্গে একবার দেখা করে আসা উচিত।

তুই কি আবার জার্মান যাচ্ছিস, না কি এখানেই থাকবি?

চলে যাব।

কথাটা রায়হান বলল খুব উদাসভাবে। গলায় এক ধরনের দুঃখ কষ্ট। শুনে আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে না।

আমি আর রায়হান তারপর রিকশায় চড়ি। তার আগে একটা হোটেল থেকে রাতের খাবার সেরে নিই।

রায়হানের বাবা ওয়ারিতে এক রুমের কাঠাখানেক জায়গার ওপর একটা বাসায় থাকে। একটা বাথরুম, ছোট্ট একটা রান্নাঘর আর মাঝারি সাইজের লম্বা একটা ঘর। একা মানুষ থাকে। হাটখোলা রোডে একটা প্রেস আছে রায়হানদের। মা আর সব ভাই বোন নিয়ে থাকে গ্রামের বাড়িতে। রায়হান বাবার কাছে থাকত। এই বাসায় থেকে কলেজে পড়ত। রায়হানের বাবা বেশির ভাগ সময় গ্রামে থাকত। তখন রায়হানের সঙ্গে অনেক রাত আমি এই বাসায় কাটিয়েছি।

ভাঙা গেট ঠেলে অন্ধকার বাড়িটায় ঢোকে রায়হান। আমি যাই পিছু পিছু। বাড়ির ভেতর কোথাও কোনও আলো নেই। অন্ধকারে হাতড়ে তাতড়ে ঘরের তালা খোলে রায়হান। দরোজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে উঠে আসে গুমোট হাওয়া। কেন যে এই গন্ধের ভেতর হঠাৎ করে আমার নদীর কথা মনে পড়ে। এই রকম দরজা খুলে গুমোট হাওয়ার ভেতর থেকে নদী কি আমাকে কখনও ডাকবে, এসো!

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালে রায়হান। রায়হানের ঘরটা সেই

আগের মতোই অগোছাল। প্রেসের টাইপকেস, ভাঙা ব্লক, আর বিভিন্ন সাইজের কাগজপত্র ডাই করা। একটা ভাঙা প্রুফ মেশিন পড়ে আছে এক কোণে। দুটো বিদেশী কালির বাক্স।

এ সবের ধারে পুরনো একটা খাট। একটা আলনায় রায়হানের বিদেশী কিছু শার্ট গেঞ্জি নোংরা হয়ে ঝুলছে। ঘরের ভেতর অচেনা একটা গন্ধ। বহুকাল পর গন্ধটা আমার নাকে লাগে। রায়হান চলে যাওয়ার পর তিন বছর এই ঘরে আমি আর ঢুকিনি।

মানুষের বোধহয় এই রকমই হয়, পুরনো গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসে কিছু স্মৃতি। দু একটা গানের লাইনের সঙ্গেও। যেমন শচীন দেবের নিশীতে যাইয়ো ফুল বনেরে ভ্রমরা গানটা শুনলে এখনও আমার চোখে ভেসে ওঠে ছেলেবেলায় গ্রামের বাড়িতে দেখা মোরগফুলগুলোর কথা। আমাদের বাগানে শীতের শেষে ফুটতো অজস্র মোরগফুল। একবার শীতকালের দুপুরে বহু দূরে বহু দূরে এক বিয়ে বাড়িতে ঐ গানটা বেজেছিল। তারপর চাঁদনী রাতে জানালা খুললে আমি বাগানে দিনেরবেলার মতো একটা দৃশ্য দেখতাম। ফুলে ফুলে উড়ছে কালো ভ্রমর। তাদের গুঞ্জনের শব্দও পেতাম। এ রকম হয়।

এখন রায়হানের ঘরে ঢুকে আমার একদিনের কথা মনে পড়ছে। এই ঘরের গুমোট গন্ধের ভেতরে বসে এক দুপুরে কাজী ডেকে রায়হানের বিয়ে দিয়েছিলাম আমরা। আমি আর দুতিনজন বন্ধু। বন্ধুরা ছিল রায়হানের। আমার সঙ্গে সেই আলাপ। কিন্তু সব ব্যবস্থা করতে হয়েছিল আমাকেই। ওরা ছিল সাক্ষী।

এখন এই গন্ধের ভেতর দাঁড়িয়ে আমি প্রথমেই রায়হানকে জিজ্ঞেস করি, লিলির খবর কি রে?

রায়হান শার্টটা খুলে আলনায় রাখে। প্যান্টটা খুলে নিজে একটা লুঙ্গি পরে, আমাকে একটা দেয়। তারপর খাটের ওপর শরীর ছেড়ে দিয়ে বলে, ওসব বলার জন্যই তোকে নিয়ে এলাম।

তারপর খাটের তলা থেকে একটা গ্রান্টসের বোতল বের করে বলে, খেতে খেতে কথা হবে।

বোতলটা দেখে আমার ভারী একটা আহ্লাদ হয়। স্কচ হুইস্কির ওপর বেজায় লোভ আমার। বাজে জিনিস খেতে খেতে মুখটা পঁচে গেছে। একটা বিষয় খেয়াল করে ভীষণ অবাক লাগে। রায়হান আগে মদ খেত না। আমি

খেতাম বলে খুব গালাগালি করত। বিষয়টা মাথার ভেতর নড়াচড়া করে। জিজ্ঞেস করি, তুই মদ ধরলি কবে?

জার্মানিতে গিয়ে। ওখানে মদ না খেলে লোকে হাসে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে অবাক গলায় বলে, তুই কি ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?

বলে কি শালা? মদ ছাড়লে খাব কি?

তাই বল।

রায়হান তারপর দুটো গ্লাসে দেড় পেগ মাপে ঢালে। জলের মিশেল দেয়। নে।

প্রথম চুমুক খেয়ে রায়হান সিগারেট ধরায়। লিলির সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

বলিস কি?

হ্যাঁ। লিলি আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে।

আমাকে জানাসনি কেন?

জানিয়ে কি হতো? লিলির জন্যই আমি দেশ ছেড়েছিলাম। জানিস টাকা পয়সার ওপর লিলির দারুণ লোভ।

সে সব মেয়েরই থাকে।

তা থাকে কিন্তু লিলির ব্যাপারটা খুব অন্যরকম। ভালবেসে ও আমাকে ঠিকই বিয়ে করল। কিন্তু ওকে যখন আমি উঠিয়ে আনতে চাইলাম, তখনই ঘাপলাটা লাগল। আমার মা-বাবাকে তো তুই জানিস। আমি যা বলব তাই মেনে নেবে। বিয়ের পরপরই আমি ভেবেছি মা-বাবাকে বলে দুপক্ষ ম্যানেজ করে লিলিকে তুলে আনব। কিন্তু লিলি রাজি হল না। বলল ব্যাপারটা যখন কেউ জানেই না। তখন ওসব ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই। তুমি বছর দুয়েক বিদেশে কাটিয়ে আস। আমি এদিকে বিএ-টা কমপ্লিট করি, তারপর হবে। কথাটা শুনে আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। লিলিকে ফেলে সত্যি আমার বিদেশে ফিদেশে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তাছাড়া বিদেশে চাকর বাকর ধরনের কাজ কর্ম করতে হয়। ওসব আমি পারব না। কিন্তু লিলি চায়। ওর ধারণা টাকা পয়সা না থাকলে প্রেম ভালবাসা সব হাওয়া হয়ে যায়। আমি গোপনে গোপনে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। কাউকে জানাই না। তোকেও না।

তাহলে তুই চলে যাওয়ার দিন আমাকে টেলিফোন করেছিল কে?

লিলিই করেছিল। ও বলেছিল তোকে বলে যেতে। আমার সময় হয়নি দেখে লিলিই তোকে টেলিফোনে জানায়।

রায়হান আবার গ্লাসে চুমুক দেয়। আমিও। আমার এখন মাথার ভেতরে খুব একটু চিনচিনে আবেশ তৈরি হচ্ছে। গ্রাস্টস তার এ্যাকশান শুরু করেছে। তবুও রায়হানের কথাগুলো আমাকে একটা কষ্টের ভেতর ক্রমশ টেনে নেয়।

রায়হান বলল, লিলির ধারণা ছিল এদেশে থেকে আমি কিছু করতে পারব না। প্রেস ফ্রেসে আর কয় পয়সা ইনকাম হয়।

হয়।

রায়হান একটু ম্লান হাসে। আসলে দোস্ত ব্যাপারটা ছিল অন্য। লিলির এক খালাত ভাই, ইঞ্জিনিয়ার, দেখতে খুব হ্যান্ডসাম, লিলির পিছু নিয়েছিল। আমাদের বিয়ের পরপরই লিলি আস্তে ধীরে খালাত ভাইয়ের প্রতি খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। ঐ কারণেই আমাকে সরিয়ে দেয়।

যাঃ!

আরে হ্যাঁ। তিনমাস আগে কলোনে বসে আমি ডিভোর্স লেটার পেয়েছি। আগামী মাসের সতের তারিখে লিলির বিয়ে, ঢাকা এসে খবরটাও নিয়ে নিয়েছি।

আমি পুরো গ্লাস গলায় ঠেলে রাগী চোখে রায়হানের দিকে তাকাই। এসব কথা তুই আমাকে জানাসনি কেন?

জানালে কি হত?

খোঁজ খবর তো নেয়া যেত! গণ্ডগোলও করা যেত।

গণ্ডগোল করে কি হবে?

বাঃ একটা কিছু...। আমরা এমনিতেই ছেড়ে দেব?

ভালবাসলে কত কি ছেড়ে দিতে হয়।

কথাটা শুনে আমার আবার নদীর কথা মনে পড়ে। কেন যে পড়ে।

রায়হান বলল, তোর সঙ্গে লিলির আর দেখা হয়নি?

না।

এই তিন বছরে একবারও না?

না দোস্ত।

বলিস কি?

হ্যাঁ। ওঃ না, দুবার দেখা হয়েছে।

তুই শালা মাতাল হয়ে গেছিস।

না। ভুলে গিয়েছিলাম। একদিন নিউমার্কেটে, আর একদিন কোথায় যেন।

একাই ছিল?

না, ওর সঙ্গে একটা ছেলে ছিল। পরিচয় করিয়ে দিল, আমার খালাত ভাই।

দেখতে কেমন?

ভালই।

ওই। ও শালার সঙ্গেই লিলির বিয়ে হচ্ছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তারপর রায়হান একটু থেমে বলল, লিলি কিন্তু তোকে খুব ভাল জানে। বলেই আমার গ্লাসে আবার ঢালে। জল মেশায়।

আমি চুমুক দিয়ে বলি, কি রকম?

হ্যাঁ, খুব ভাল জানে।

আমি মাতাল গলায় হাসি। আমাকে তো কোনও মেয়ের ভাল লাগার কথা না রে।

লিলির খুব লাগে। এই নিয়ে লিলিকে আমি কত ক্ষেপিয়েছি।

এই, লিলির সঙ্গে তোর কিছু হয়নি?

কি?

সেক্সচুয়াল ব্যাপার ট্যাপার।

না।

চুমু টুমুও খাসনি?

দুচারটে খেয়েছি। যাওয়ার আগে একদিন খুব আদর করতে করতে বলেছিলাম, আজ আমাদের এসব ব্যাপার ট্যাপারগুলো হয়ে যাক। লিলি বলল, তুমি ফিরে এসো, তারপর।

ওসব করে গেলে পারতি।

লিলি চায়নি।

ওসব হয়ে গেলে মেয়েদের আকর্ষণটা খুব বেড়ে যায়।

রায়হান কথা বলে না। গভীর করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর গ্লাসে চুমুক দেয়।

তিন গ্লাসের মাথায় আমার খুব চোখ টানতে থাকে। আমি কোনও কথা

না বলে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি। রায়হান একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার ঠোঁটে গুঁজে দেয়। তুই আমার জন্য একটা কাজ করবি?

কী কাজ?

আমার জন্য তো অনেক কিছুই করেছিস। একটা শেষ কাজ কর।

কাজটা কী বলবি তো?

লিলিকে একবার নিয়ে আসবি।

কেমন করে?

তুই বললেই আসবে।

আমি তো ওদের বাসাও চিনি না।

আমি চিনিয়ে দেব।

ব্যাপারটা কেমন!

শোন, বাজে কথা বলিস না। লিলি তো সকালবেলা কলেজে যায়। সে সময় ডেকে আনবি। আমি শুধু ওকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করব।

দেখা যাবে।

দেখা যাবে না। কাল সকালে কাজটা তোকে করতে হবে। আমি দিন দশেকের মধ্যেই আবার জার্মান ফিরে যাব। হয়ত বা আর কখনও ফিরব না।

কথাটা বলতে বলতে রায়হানের গলা ভেঙে আসে। একটা মেয়ের জন্যে রায়হানের জীবনটা ছাই হয়ে গেল ; নদীর জন্যে আমারও কি এ রকম হবে! কথাটা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি বুঝতে পারি না।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে দেখি রায়হান কাৎ হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। গ্রান্টসের বোতল আর দুটো গ্লাস পড়ে আছে পাশে। বোতলটা পুরো শেষ।

রায়হানের দিকে তাকিয়ে আমার খুব দুঃখ হয়। বিছানা থেকে নেমে রায়হানকে টেনে তুলি। ঘড়িতে তখন আটটা বেজে দশ মিনিট। চোখ মেলে রায়হান ম্লান হাসে। রাতেরবেলা খুব গরম লেগেছিল, তাই নিচে শুয়েছি।

আমি কোনও কথা বলি না। সিগারেট ধরাই।

বোতলটা খাটের নিচে রাখতে রাখতে রায়হান বলল, কটা বাজে রে?

সোয়া আটটা।

তাহলে এখুনি যেতে হয়।

কোথায়?

আরে ভুলে গেলি নাকি শালা! লিলিদের ওখানে না যাওয়ার কথা।

ও।

রায়হান জামাকাপড় পরে। ওর দেখাদেখি আমিও।

ঠিক সাড়ে আটটার দিকে গোপীবাগে লিলিদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াই আমরা। দূর থেকে দোতলা সাদা বাড়িটা দেখিয়ে রায়হান বলে, এটাই লিলিদের বাড়ি। লিলি এখুনি কলেজে যাবে। যেমন করে পারিস ওকে তুই নিয়ে আসবি। এই কাজটা কর। আমি বাসায় গিয়ে ঘরটা একটু ঝেড়েঝুড়ে রাখি।

রায়হান আর কোনও কথা না বলে রিকশা নিয়ে চলে যায়। আমি টের পাই, একটু একটু খিদে পেয়েছে। কিছু খাওয়া উচিত। কিন্তু খেতে গেলে লিলি যদি বেরিয়ে যায়!

আমি একটা সিগারেট ধরাই। তারপর লিলিদের বাড়ির দিকে চোখ রেখে লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকি।

লিলি বেরোয় মিনিট বিশেক পর। পরনে সাদা শাড়ি জরির কাজ করা লাল নীল চমৎকার পাড়। কপালে লাল টিপ পরেছে লিলি। ঠোঁটে হালকা লাল লিপস্টিক। একটু ভেজা ভেজা ঠোঁট লিলির।

ঠোঁটের দিকে তাকালেই পুরো তিন মিনিট চুমু খেতে ইচ্ছে করে। লিলির কাঁধে বাটিক প্রিন্টের চমৎকার ব্যাগ।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমাকে দেখে। দেখে কি একটু চমকে যায়? বুঝতে পারি না। কিন্তু লিলি আমাকে দেখে ভারি মিষ্টি করে হাসে।

তারপর রাস্তা পেরিয়ে চমৎকার ভঙ্গিতে হেঁটে আসে। দেখে মনে হয় পুরো তিন বছর সময় লিলি তিন সেকেন্ডে পেরিয়ে এল।

আমি মুগ্ধ হয়ে লিলিকে দেখছিলাম। লিলি খুব সুন্দর হয়ে গেছে। বেশ ভরাট শরীর। আকর্ষণীয়। চোখ-মুখে উপচে পড়ছে উজ্জ্বলতা। দেখে আমার কেন যেন মনে হয় বহুকাল লিলির মতো উজ্জ্বল কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয় না। এরকম দেখা হওয়ার কি কথা ছিল!

লিলি বলল, আপনি? কেমন আছেন? ভাল?

আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

ওমা, আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?

তুমি করে বলতাম নাকি?

ভুলে গেছেন?

কি জানি। বহুকাল পর তোমার সঙ্গে দেখা।

হ্যাঁ, তিন বছর। অবশ্য আমি আপনাকে দু'তিন দিন দেখেছি।

আমিও।

ডাকেননি কেন?

তুমি ডাকনি কেন?

বারে, মেয়েদের কত রকমের প্রবলেম থাকে!

হয়ত আমারও ছিল।

লিলি আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর হাসে। হঠাৎ করে আমাদের বাসার সামনে! চিনলেন কেমন করে?

আমি মাথা চুলকে বলি, চিনে ফেললাম। তোমার কলেজ কখন?

এই তো যাচ্ছি।

আজ কলেজে না গেলে হয় না?

কেন?

তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

কোথায় বসে বলবেন?

এ কথায় আমি একটু থতমত খেয়ে যাই। রায়হানের ব্যাপারটা তুলব কেমন করে। সরাসরি বললে লিলি যদি রাজি না হয়।

লিলি বলল, আপনার বন্ধুর খবর কী?

আমি হঠাৎ করে ঠিক বুঝতে পারি না লিলি কার কথা বলছে। বোকার মত বলি, কোন বন্ধু?

লিলি হাসে। বুঝতে পারছেন না?

ও। ওতো এখন ঢাকায়।

তাই নাকি! কবে এসেছে?

তিন-চারদিন।

তারপর আমি একটু চালাকি করে, যেন কিছুই জানি না এমন স্বরে বলি, কেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি?

না।

তুমি জান না ও যে ঢাকায় এসেছে?

না। আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই।

কেন?

আপনি কিছু জানেন না?

নাতো।

লিলি হঠাৎ করে চারদিকে চায়। একবার ওদের বাড়ির দিকে। তারপর বলে, চলুন যেতে যেতে বলছি।

একটা রিকশা ডেকে আমি খুব স্মার্টভাবে চড়ি। তারপর লিলিকে ডাকি, এসো।

লিলি কোনও প্রশ্ন করে না। কোথায় যাচ্ছি, কি বিত্তান্ত কিছুই না। অবলীলায় রিকশায় চড়ে।

লিলির পাশে বসে আমি টের পাই লিলির গায়ে অদ্ভুত গন্ধ। চারদিকের বাতাস সুবাসিত করে দিচ্ছে লিলি। সুন্দর গন্ধের প্রতি মানুষের যে কি দুর্বলতা! আমার হঠাৎ করে মন খুব ভাল হয়ে যায়। মনে হয় এক্ষুণি যেন ঘুমিয়ে পড়ব।

লিলি খুব দুঃখের গলায় বলল, আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

বল কি?

হ্যাঁ। চলে যাওয়ার কিছুকাল পরেই। ব্যাপারটা আমিই ঘটিয়েছি।

কেন, অমন করতে গেলে কেন?

আসলে ওর সঙ্গে আমার ঠিক এডজাস্ট হচ্ছিল না। ও চলে যাওয়ার পর ব্যাপারটা বুঝতে পারি।

তাহলে অমন হুট করে বিয়ে করেছিলে কেন?

আসলে আমি আমাকে ঠিক বুঝতে পারি না। কখন যে কী করে ফেলি! ওর সঙ্গে বেশ কিছুকাল প্রেম করলাম। কিন্তু প্রেমিকের জন্য সত্যিকার যে টান থাকে মেয়েদের, আমার সেটা একদম ছিল না। ওর সঙ্গে দেখা না হলে আমি ওর কথা ভুলে যেতাম। দেখা হলে আবার অন্যরকম লাগত। বিয়েটাও ঠিক এভাবেই করেছিলাম। হুট করে, কিছু না বুঝে। তারপর যখন বুঝতে পারি এ আমি কী করেছি, তখুনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওকে জার্মান পাঠালাম। ও ভাবল আমি খুব লোভী মেয়ে। টাকা পয়সা ছাড়া অন্য কিছু জানি না। ও খানিকটা অভিমান করেই কাউকে না জানিয়ে চলে গেল। আমি টেলিফোনে খবরটা আপনাকে জানিয়েছিলাম।

মনে আছে।

লিলি হঠাৎ করে হাসে। আপনি আমার গলা বুঝতে পেরেছিলেন?

না। খুব চেনা চেনা লেগেছিল। কিন্তু কোথায় শুনেছি, মনে করতে পারিনি।

লিলি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর মুগ্ধ গলায় বলে, আপনি খুব রোমান্টিক।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, খুব। আপনার বন্ধুর একদম রোমান্টিকতা নেই।

প্রেম করার সময় এটা বোঝোনি?

না। তাহলে কী এত কিছু হয়?

রোমান্টিক পুরুষ তুমি খুব পছন্দ কর?

হ্যাঁ, খুব।

আমি একটু থেমে গলা ভারি করে বলি, রায়হানের সঙ্গে তো তোমার ছাড়াছাড়ি হয়েই গেছে, চল তাহলে আমরা বিয়ে করি।

লিলি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর হেসে বলে, যা! আমার যে আগামী মাসে বিয়ে।

হোক না, ওটাও করবে।

লিলি হাসে। আপনার বউর অন্য জায়গায় বিয়ে হলে কষ্ট হবে না?

হবে। রায়হানের মতো আমিও কষ্ট পাব। দুই বন্ধু গলা জড়াজড়ি করে একই বউর জন্য কাঁদব।

চলুন তাহলে, বিয়ে করি!

চল।

আমি রিকশাঅলাকে বলি, ওয়ারি যাও।

লিলি বলল, ওয়ারি কোথায়?

রায়হানের বাসায়। ওখানেই বিয়ে হবে। রায়হান সাক্ষী।

লিলি কথা বলে না, হাসে।

রায়হানের বাসার গেটে নেমে রিকশা ভাড়া মেটাতে মেটাতে আমি বলি, রায়হান তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। কী কথা আছে।

জানি।

রাগ করনি তো?

না। ভালই হলো! ওর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। ওর রিয়্যাকশানটা আমি দেখতে চাই।

লিলি মনোরম ভঙ্গিতে রায়হানের ঘরের দিকে হেঁটে যায়। রায়হান দাঁড়িয়েছিল। বারান্দায়। আমি চেঁচিয়ে বলি, রায়হান, আমি নাস্তা করে আসি। তোরা কথা বল।

বাইরে থেকে গেটটা টেনে বন্ধ করে দিই। তখুনি এক ঝলক হাওয়া আসে। সেই হাওয়া আমার বুকের ভেতর গড়িয়ে গড়িয়ে যায়। মনটা চনমন করে ওঠে। বহুকাল পর একটা কাজ করলাম। নিজের পিঠ চাপড়ে নিজেকে একটা থ্যাংক ইউ দিতে ইচ্ছে করে।

ঘন্টাখানেক পর ফিরে এসে দেখি গেটটা আমি যেভাবে টেনে বন্ধ করে গেছি, তেমনি আছে। আস্তে আস্তে ঠেলে গেটটা খুলি। রায়হান লিলির কথা টথা কী শেষ হল! তিন বছর পরে ওদের দেখা হল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওদের মধ্যে কে প্রথম কথা বলেছে? রায়হান না লিলি? কী বলেছে? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। কেন যে নাস্তা খেতে গেলাম। দৃশ্যটা দেখে গেলেই হত।

উঠোন পেরিয়ে রায়হানের ঘরের দিকে হেঁটে যাই।

রায়হানের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বারান্দার দিকের জানালায় মোটা কাপড়ের পর্দা। জানালার কপাটের মতন ভারি। পর্দা টেনে দিলে ঘরের ভেতর আলো ঢোকে না।

দরজা বন্ধ করে ওরা কী করছে?

আমি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে বারান্দায় উঠি। তারপর পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াই জানালার সামনে। কান পেতে থাকি ভেতরের কোনও শব্দ পাওয়া যায় কিনা।

না, কোনও শব্দ নেই।

আমি চোরের মতো নিঃশব্দে, ডান হাতের মধ্যে আঙুল দিয়ে পর্দাটা একটু সরাই। তারপর ভেতরে তাকাই। তাকিয়েই চমকে উঠি। খাটের ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে লিলি। পরনে শাড়ি ব্লাউজ কিচ্ছু নেই। ঠোঁটের লিপস্টিক মুছে গেছে। কপালের টিপ ছড়িয়ে গেছে কপালময়। চোখের উপর বাঁ হাতটা আড়াআড়ি ফেলে পড়ে আছে লিলি। লিলির ঠোঁট দুটো কি একটু কাঁপছে! লিলি কি কাঁদছে!

আমি কিছু বুঝতে পারি না। ফ্রিজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। রায়হান বসেছিল লিলির পাশে। সিগারেট টানছিল। রায়হানের চোখে মুখে এক ধরনের পরিতৃপ্তি ছায়া ফেলেছে।

বুঝতে পারি, আমি সব বুঝতে পারি।

কিন্তু রায়হান এসব কী করল! লিলিকে ডেকে আনলাম আমি। রায়হান বুঝল না, লিলি চিরকাল দোষ দেবে আমাকে। আমি এখন কী করব? ভেতরে ঢুকে রায়হানকে মারব! শুয়োরের বাচ্চা বলে গাল দেব? লিলি বুঝুক আমি এসব চাইনি। আমার কোনও দোষ ছিল না।

দরজায় নক করতে যাব, কে যেন আমার হাত চেপে রাখে। তোমার কী শালা! লিলির কাছে রায়হানের যা পাওনা ছিল বুঝে নিল। পুরুষ মানুষ এ রকমই হয়।

আমি আবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি মারি। ভেতরে তখন আবার শুরু হয়েছে একটা ব্লু ফিল্ম। রায়হানের পিঠ দুহাতে খামচে ধরে ছটফট করছে লিলি।

সইতে পারি না, আমি এসব সইতে পারি না। আস্তেধীরে উঠোন পেরিয়ে বেরিয়ে যাই। তারপর উদভ্রান্তের মতো রিকশা নিয়ে সোজা চলে আসি ইউনিভার্সিটিতে। নদীর সঙ্গে দেখা না হলে আমি আজ মরে যাবো। নদীর চোখের দিকে না তাকালে বুঝতেই পারব না রায়হান ভুল করেছে। পৃথিবীতে ওসবের বাইরেও রয়ে গেছে কত সুখ। নদীর চোখ আমাকে সে কথা বলে দেবে।

পাবলিক লাইব্রেরির গেটের সামনে নেমে আমি একটা সিগারেট ধরাই। তারপর বিষণ্ন ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে টানতে লাইব্রেরির বারান্দার দিকে যাই। রিকশায় বসে রায়হান লিলির পুরো ব্যাপারটাই ভুলে গিয়েছিলাম। কেবল মনে পড়েছে নদীর কথা। বারবার বুকের অনেক ভেতর থেকে নদী আমাকে ডেকেছে চলে এসো। আমি কতকাল তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। আর চোখে দেখেছি সুন্দর একটা দৃশ্য। বারান্দায় একা, বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে আছে নদী। ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর থেকে ডান হাতটা বাকলহীন ইউক্যালিপটাস গাছের মতো উঠে গেছে থুতনির কাছে। নদীর চোখে নদীর মতন উদাসীনতা। আমাকে দেখেই নদী তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, এসো, হাত ধর।

গেট দিয়ে ঢুকে দেখি নদী সত্যি সত্যি বসে আছে। পরনে প্রিয় নীল শাড়ি। কিন্তু আমি যে রকম দৃশ্যের কথা ভেবেছিলাম, দৃশ্যটা ঠিক তার উল্টো। নদীর সঙ্গে বসে আছে সুন্দর এক যুবক। পরনে বিদেশী সাদা শার্ট প্যান্ট। নদী মুগ্ধ হয়ে যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। দেখেই আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। নদীর পাশে অন্য কোনও পুরুষ, ভাবতেই বুকের ভেতর পুরো পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট ঢুকে যায়। ইচ্ছে করে ছুটে পালাই। ও রকম দৃশ্যের কাছে আমি কখনও ফিরে যাব না।

কিন্তু নদী আমাকে দেখে ফেলে। দেখেই উঠে দাঁড়ায়। আর আমাকে কে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যায় নদীর কাছে।

নদী আমার মুখের দিকে দুপলক তাকিয়ে থাকে। কি কি দেখে কে জানে। তারপর যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। মুহূর্তে আমার জানা হয়ে যায়, এই হচ্ছে নায়ক। নদীর প্রিয় পুরুষ।

যুবক হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরে। আমিও তার হাত। যুবকের সঙ্গে নদীকে খুব মানায়! আমার যে কি রকম লাগে নিজেকে। ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় একটা সুন্দর দৃশ্য আমি এইমাত্র নষ্ট করে দিলাম। আমি কি কেবল সুন্দর দৃশ্য নষ্ট করার জন্যেই! নষ্ট মানুষ!

দুএকটা ফর্মাল কথাটথা বলে আমি চলে আসি। কলাভবনের পশ্চিমের গেট থেকে রিকশা নেই। কোথায় যাব, আমি এখন কোথায় যাব।

রিকশায় বসে আমার তারপর চারদিকের ঢাকা শহর দুঃখময় মনে হয়। বড় অনাত্মরিক, বড় নির্দয় শহর। আমি এই শহর ছেড়ে যাব। দূরে বহু দূরে কোথাও চলে যাব।

নদী

ক্লাস থেকে বেরিয়ে সেমিনারের সামনে এসেছি, তখন নিচের খোলা চত্বর থেকে গাছপালা কাঁপিয়ে ভারি মন খারাপ করা একটা হাওয়া উড়ে আসে। আমি রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সঙ্গে মিনু তানি আর দু একটা মেয়ে। নিচে ইউনিভার্সিটি চত্বরের মধ্যে একটা আইল্যান্ডে দুটো বিশাল মূর্তি বানানোর কাজ চলছে অনেকদিন ধরে। শিল্পীরা হাতুড়ি বাটাল নিয়ে খুটখাট কাজ করে যায় সকাল থেকে সন্ধে অবধি। রোদে মাথা পুড়ে যায় বলে মাথায় ক্যাপ পরা একজনের। দুচারটে উৎসাহী ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মূর্তি বানান দেখছে।

ঠিক এ সময় হাওয়াটা আসে। দুটো মূর্তির ফাঁক ফোকড় দিয়ে উড়ে সরাসরি একেবারে আমার বুকে। সেই হাওয়ায় কী ছিলো কে জানে। আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। আর কেন যে ওর কথা মনে পড়ে। সেদিনের পর ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। পাঁচদিন হয়ে গেলো। রোজই ইউনিভার্সিটি এসেছি। ক্লাস শেষে পাবলিক লাইব্রেরির বারান্দায় বসে থেকেছি। গেটে নক হলেই বার বার ছুটে গেছি। ও আসেনি। রাতেরবেলা কেন যে মনে হয়েছে ও আর কখনও আমার কাছে আসবে না। আমি কেমন আছি জানতে চাইবে না। কেঁদেছি, কত যে কেঁদেছি এ কদিন।

একদিন ঘুমের ঘোরে মাঝরাতে কাঁদছিলাম। বুঝি শব্দ করেই। নিজে বুঝতে পারিনি। নুপু শোয় আমার পাশে। কান্নার শব্দে নুপু জেগে গিয়েছিল। জেগেই আমাকে ঠেলে দিয়েছে। হকচকিয়ে উঠেছি। তখন বুঝতে পারি কাঁদছিলাম। গাল বেয়ে জল পড়ছে বালিশে। বালিশটা ভেজা-ভেজা।

নুপু বললো, কি হয়েছে রে আপা?

এ কথায় আমার যে কি হয়ে যায়, দুহাতে নুপুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদি। নুপু বার বার জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে। আমি কোনও জবাব দিই না। কাঁদি, কেবল কাঁদি।

আমি কি সেদিন ওকে স্বপ্নে দেখেছিলাম। স্বপ্নে দেখে কেঁদেছি। কিছু মনে পড়েনি।

এ আমার কী হল!

সেদিন ও চলে যাওয়ার পর থেকেই আমার ভেতর কি যে এক অবস্থা! অমু তানিদের সঙ্গে চাইনিজ খেতে গেছি। অমুর সঙ্গে খেতে গেলে বরাবরই মেনু ঠিক করি আমি। সেদিনটা খুব অন্যরকম ছিলো। অমুর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়ে ভুল করেছি। কেন মনে হয়েছে ও আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না। আর এ কথা ভেবে কি যে এক দুঃখের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। মেনু ঠিক করতে বিরক্ত লাগছিল। দুবার ঠেলে দিয়েছি মিনুর দিকে, তুই কর।

মিনু রাজি হয়নি। আমি এসব পারি না বাবা। তুমিই কর।

তানি বলল, তোমার কর্তার সঙ্গে এসেছি তুমি ছাড়া অন্য কার অধিকার আছে মেনু ঠিক করার!

অমু মুখ নিচু করে হেসেছে। মিনু আর তানিও। কথাটা আমি ঠিকঠাক বুঝতে পারিনি। কেন যে মাথায় এসব ঢুকতে চায়নি।

তোমার কর্তা। শব্দটা মাথার ভেতর খট খট করে বেজেছে। কর্তা! কর্তা মানে? আমার সব কিছুর মালিক অমু। শরীর, মন সব কিছুর।

তাই তো নিয়ম।

কিন্তু ও যে...

আমি যে ওকে ও আমার ভেতরের কোথাকার কি একটা ব্যাপার, নিজের অজান্তেই...

তাহলে অমু আমার কর্তা হয় কেমন করে।

আমার হঠাৎ করে ভীষণ জোরে, একসঙ্গে একশোটি কাচের গ্লাস ভেঙ্গে ফেলার মতন শব্দে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিলো।

কে যে গলা চেপে রাখে। মেনু ঠিক করে দিই। কিন্তু গণ্ডগোলটা লাগে পরে। স্যুপের অর্ডার দিয়েছিলাম। কর্নস্যুপ। দুটো। কিন্তু স্যুপ আসে চারটে। দুটো কর্ন, দুটো ভেজিটেবল। দেখে মিনু তানিদের সঙ্গে আমিও হাঁ। বেয়ারাকে ডেকে বলি, কী ব্যাপার? এতগুলো স্যুপ কেন?

বেয়ারা হেসে বলে, আপনিই তো অর্ডার দিলেন ম্যাডাম।

আমি তো চিকেন উইথ ভেজিটেবলের কথা বলেছি।

জ্বি না, চিকেন ভেজিটেবলের কথা বলেননি।

অমু বলল, ঠিক আছে, একটা চিকেন ভেজিটেবল দাও।

মিনু হেসে বলে, ওসবের আর দরকার কি, শুধু স্যুপেই তো পেট ভরে যাবে।

আমি তখন পুরো ঘটনাটা ভুলে গেছি। ওর কথা ভাবছিলাম। ও যদি সত্যি-সত্যি আর আমার সঙ্গে দেখা না করে! তাহলে আমার কি হবে! তানি আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে বলল, কি ভাবছিস?

সঙ্গে সঙ্গে আমি চমকে উঠি। প্রথমে বুঝতেই পারি না কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। ইউনিভার্সিটির বারান্দা, সামনে খোলা চত্বরে সবুজ ঘাস রোদে পুড়ে যাচ্ছে, বিশাল মূর্তি বানাচ্ছে কজন শিল্পী আর আমার চারপাশে মিনু, তানি আরও কতগুলো মেয়ে, কাউকেই ঠিকঠাক চিনতে পারি না। মনে হয় এখানে আমি কখনও আসিনি। এদের কারও সঙ্গে কখনও আমার দেখা হয়নি।

মিনু বলল, কিরে বাড়ি যাবি না?

আমার হঠাৎ সব মনে পড়ে। নতুন দৃশ্যটা মুহূর্তে চোখ থেকে মুছে যায়। জেগে ওঠে বহুকালের চেনা এই সব দৃশ্যাবলি, মানুষজন।

কটা বাজে?

তানি বলল, বারটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

এখুনি বাড়ি গিয়ে কি করব?

তাহলে চল টিএসসি-তে বসি।

চল।

দলবেঁধে নিচে নেমে আসি। আর্টস বিল্ডিংয়ের চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় আসতেই মনে হয় টিএসসি-তে গিয়ে কি করব। তারচে মতিঝিলে ওর অফিসে চলে যাই। আজ ওর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। আমাকেই যেচে যেতে হবে। ও কখনও আসবে না। যা অভিমানী! এলে তো এই পাঁচ দিনের মধ্যে আসতোই। আমি মিনুকে বলি, মিনু বাড়িই চলে যাই। ভাল্লাগছে না। তানি বলল, ঠিক আছে যা। আমরা দুটো পর্যন্ত আড্ডা মারব।

আমি আর কাউকে কিছু না বলে রিকশায় চড়ি।

হাইকোর্টের সামনে এসে রিকশাঅলা বলে, কই যাইবেন আপা?

আমার তখন খেয়াল হয় রিকশাঅলাকে বলাই হয়নি কোথায় যাব। গলা খাকারি দিয়ে বলি, মতিঝিল।

তারপর মনে পড়ে মিনু তানিদের বাড়ি যাব। ওদের কাছে ওর কথা বলা যাবে না। বললে আমাকে নষ্ট মেয়ে ভাববে। একজনকে রেখে আরেকজনের কথা ভাবছি। কী নোংরা ব্যাপার। কিন্তু ওরা যে বুঝতে পারবে না আমার ভেতর কি হয়ে গেছে।

ও আস্তেধীরে একদিন আমাকে পুরোপুরি দখল করে নেবে। নেবে কি!

মানুষের অনেক ব্যাপার থাকে যা কোনওদিন কাউকে বলা যায় না। কেবল বুকের ভেতর বানকুড়ালি হাওয়ার মতো ঘুরে ঘুরে বয়ে যায়। পোড়ায়। ও আমাকে পোড়াচ্ছে। ওর কথা পৃথিবীতে কাউকে বলা যাবে না। মতিঝিলে ওর অফিস তিনতলায়। এয়ারকন্ডিশান করা একটা রুমে ও আর ওর বস্ বসে। গ্লাসটপ চকচকে পারটেক্সের সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ওপাশে রিভলবিং চেয়ার।

টেবিলের সামনে তিনটে করে কালো বার্নিসের গদিঅলা চেয়ার। গেস্ট এলে বসে। টেবিলের ওপর কালো বনেদী টেলিফোন। আর কাচের তলায় পুরো টেবিল জুড়ে কত লোকের যে ভিজিটিং কার্ড! আর আছে ওর কোনও এক আর্টিস্ট বন্ধুর বলপয়েন্টের দ্রুত আঁকা ওর একটা স্কেচ। ঐ ছবিটা দেখলে কেন যে হরিদাস পাল নামটা মনে আসে। একদিন ওকে বলেছিলাম, হরিদাস পাল কথাটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করেছিলাম।

সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠতে উঠতে আমার কী রকম যেন লাগতে থাকে। মনে হয় বহুকাল পর আজ ওর সঙ্গে দেখা হবে। রুমে ঢুকে দেখব রিভলবিং চেয়ারে বসে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে কাজ করছে। চারদিকের পৃথিবীতে কোনও শব্দ নেই। ওর টেবিলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ফাইলপত্র। হাতের কাছে ট্রিপল ফাইভের প্যাকেট আর নীল ইলেকট্রনিক লাইটার। আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াব, ও টেরই পাবে না। যখন কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে দেখবে আমি দাঁড়িয়ে, হঠাৎ করে চোখ দুটো ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে যাবে ওর। আঃ আমার যে কী ভাল লাগবে। আমি ওর দুঃখী মুখ কখনও দেখতে চাই না।

তিনতলায় উঠে ওর রুমের সামনে দেখি টুল নিয়ে বসে আছে পিয়ন। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ায়। হাত তুলে সালাম দেয়। আমি অনেক বার এসেছি এখানে। পিয়নটা আমায় চেনে। আমি ওর সালামের পরিবর্তে মৃদু হেসে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকি। ঢোকার সংগে সংগে হীমশীতল হাওয়া আমায় জড়িয়ে ধরে। শরীরটা মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

কিন্তু রুমে যে ও নেই। চেয়ারটা শূন্য পড়ে আছে। টেবিলের ওপর কালো টেলিফোন, পিন কুশন, কলমদানি তাতে লাল কালো দুটো কলম, একটা কাচের ঝকঝকে এসট্রে। দেখে আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে।

পাশের টেবিলে ওর বস্ বসেছিল। মাথা নিচু করে কাজ করছিল। আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায়। তারপর ভদ্রতার হাসি হাসে। আসুন।

আমি ঘাসরঙয়ের মোটা কার্পেটের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াই তার টেবিলের সামনে।

বসুন। আমি কোনও কথা না বলে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ি। কোনও রকমে বলতে যাব, ও নেই? তার আগেই ভদ্রলোক বললেন, আপনি এসেছেন, ভালই করেছেন। আমি আপনাকে খুঁজছিলাম।

আমাকে?

হ্যাঁ। তারপরই ভদ্রলোক টেবিলের পাশে লাগান কলিংবেলের সুইচ টেপেন। মিষ্টি টুংটাং শব্দ তুলে কলিংবেল বেজে ওঠতেই দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে পিয়ন। ভদ্রলোক চায়ের কথা বলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না তো।

কদিন?

পাঁচ ছদিন।

আচ্ছা ওর ব্যাপারটা কি বলুন তো?

কী হয়েছে?

পাঁচদিন ধরে অফিসে আসছে না। তার আগেও চার পাঁচদিন আসেনি। দুপুরে আমি গেছি লাঞ্চে, ফিরে এসে দেখি আমার টেবিলের ওপর ওর রেজিগনেশান লেটার আর ড্রয়ারের চাবি। পিয়নকে জিজ্ঞেস করতেই বলল, আধঘণ্টা বসে ছিল রুমে। তারপর পিয়নকে না বলেই বেরিয়ে গেছে।

কথাগুলো শুনে হঠাৎ করে আমার চোখ থেকে ভদ্রলোকসহ পুরো রুমটা মুছে যায়। আমি কিছু দেখতে পাই না। শুনতে পাই বহুদূরে বিনবিন করে বাজছে ভারি একটা দুঃখের সুর। আসলে সেটা ছিল এয়ারকুলার চলার শব্দ।

ভদ্রলোক বললেন, কারণটা বুঝতে পারলাম না। চাকরি ছেড়ে দেয়ার মতো কি হল ওর! অফিসে তো কখনও কারও সঙ্গে ওর কোনও রকমের বাজে কিছু ঘটেনি। আমি ওর বস ঠিকই। কিন্তু ও কখনও আমাকে স্যার বলেনি। প্রথম চাকরিতে ঢুকে দুএকদিন বলেছিল। আমিই মানা করে

দিয়েছি। পরে ও আমাকে আজিম ভাই বলত। আমরা এক সঙ্গে সিনেমা দেখতাম, ঘুরে বেড়াতাম। ও আমাকে ওর সব কথা বলত। আমিও আমার সংসারের সব কথা ওকে বলতাম। আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরাও ওকে খুব ভালবাসে। রোববার দিনটা তো ওর কাটত আমার বাসায়।

ভদ্রলোক একটানা কথা বলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছিল না কিছু।

ঠিক এ সময় পিয়ন চা দিয়ে যায়। ভদ্রলোক চায়ের পেয়ালা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন, প্লিজ।

আমি আনমনে চায়ে চুমুক দিই। ভদ্রলোক তখন সিগারেট ধরান। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন, আমাকে কিছু না বলে ও চাকরি ছেড়ে দিল, ব্যাপারটা কেমন যেন। ভেতরে ভেতরে অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখলাম কারও সঙ্গে ওর কিছু হয়েছে কিনা। না, কেউ কিছু বলতে পারল না। একাউন্টসে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, শপাঁচেক টাকা এডভান্স নিয়েছে। সেদিনই। আমি এখনও বড় সাহেবকে জানাইনি কিছু। রেজিগনেশান লেটারটা পড়ে আছে আমার ড্রয়ারে।

ভদ্রলোক একটু থামেন। তারপর চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানেন। আমার কিছু একটা বলা উচিত। কিন্তু কি বলব? আমার কিছু মনে পড়ছে না। মুখে আসছে না কোনও কথা। কী করব আমি, এখন কী করব?

ভদ্রলোক বললেন, রেজিগনেশান লেটারটা পেয়েই ওদের বাসায় টেলিফোন করেছিলাম। ওর মা ধরলেন। সব শুনে টেলিফোনেই কেঁদে ফেললেন ভদ্রমহিলা। ও নাকি কয়েক দিন ধরে বাসায়ও যাচ্ছিল না। একদিন রাতেরবেলা রাগারাগি করে বেরিয়ে গেছে। কাল ওর বড়ভাই এসেছিলেন। কোনও খবর পাওয়া যায়নি। খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। অনেক কথা বললেন। বেশ ভাল ব্যবসা ট্যবসা করেন। ওর নামেও নাকি একটা কনস্ট্রাকশন ফার্ম আছে। আশি হাজার টাকার একটা বিল হয়ে পড়ে আছে। ওর সিগনেচার ছাড়া তোলা যাচ্ছে না। অবশ্য চাকরিতে রেজিগনেশান দিয়েছে এই নিয়ে ভদ্রলোকের কোনও রকমের মাথাব্যথা নেই। বললেন, ওকে তো চাকরি করতে আমরা কেউ বলিনি। ঘণ্টা দুয়েক করে বিজনেসটা দেখলেই চলে যেত। আর এসব চাকরি বাকরি করে কি করবে জীবনে। ও অবশ্য প্রথম প্রথম কিছুদিন দেখেছিল। তারপর বলল এইসব লেবার টেবার আর মিস্ত্রীদের ও ম্যানেজ করতে পারবে না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, টাকা পয়সা দিচ্ছি বিদেশে চলে যাও। তাও রাজি হল না। ঢুকল চাকরিতে।

আমি ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়েছি বইখাতাগুলো। কোনও রকমে বলি, যাই।

ভদ্রলোক বললেন, আপনার সংগে দেখা টেখা হলে প্লিজ একবার আমার সংগে দেখা করতে বলবেন।

আমি মাথা নাড়ি। কিন্তু বুকের ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, এ জীবনে তার সংগে আর কখনও তোমার দেখা হবে না।

নিচে এসে আমি একটা রিকশায় চড়ে বসি। কোথায় যাব, কি করব কিছু বুঝতে পারি না। রিকশা চলতে থাকে। ওদের বাসায় যাব! গিয়ে কি করব! বরং আরও একটু দুঃখ পেয়ে আসা। হয়ত আমাকে দেখে ওর মা কাঁদবেন, ঊষা কাঁদবে। দোষ তো আমারই। আমিই তো ওকে সংসার বিবাগী করে দিলাম।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে দিয়ে রিকশা যাচ্ছিল। আমি অকারণে সেখানে নেমে পড়ি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান চমৎকার পার্ক। রোদ ঝিমঝিম করছে পার্কে। দুএকজন লোক, দুএকটি মেয়ে, প্রেমিক প্রেমিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইতিউতি। আমি কিছু খেয়াল করি না। আস্তেধীরে নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজে হাঁটতে থাকি। পার্কের দক্ষিণ দিকটা বেশ নির্জন। নিবিড় হয়ে আছে গাছপালা। ফুল ফুটেছে, উড়ছে প্রজাপতি। এই সুন্দর পরিবেশের ভেতর আমি চিরকালীন দুঃখী মানুষের মতো একটা ঝোঁপের আড়ালে, নরম ছায়ায় গিয়ে বসি। বসে থাকি। বহুদূরে কোথায় কি একটা পাখি ডেকে যায়। একটা হাওয়া বয়ে যায় ঘুরে ঘুরে। আমি বসে থাকি। বসে থাকি। আমার সামনে ছিল কী একটা অচেনা ফুলের গাছ। লাল টুকটুকে একটা ফুল ফুটে ছিল সেই গাছে। বাতাসে কী সুন্দর যে দুলছিল ফুলটা। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। আমার সম্পূর্ণ ফুটে উঠা হল না। দিলে না, তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ফুটে উঠতে দিলে না।

আমি তারপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকি।

আমি

তিনতলায় উঠতেই পিয়নটা আমায় হাত তুলে সালাম দেয়। তারপর দরজাটা খুলে ধরে। আমি কোনও কথা না বলে ভেতরে ঢুকি। রুমটা খা খা নির্জন। বস্ নেই। লাঞ্চে গেছে। আমি এখন কি করব, ঠিক বুঝতে পারি না। খানিকক্ষণ বোকার মতো আমার আর বসের টেবিলের মাঝখানে কার্পেটে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। সম্পূর্ণ পরিবেশটা ভীষণ অচেনা লাগে। এখানে আমি কখন এসেছি মনে পড়ে না।

একটা সিগারেট ধরাই। তারপর আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াই। গ্লাসটপ সেক্রেটারিয়েট টেবিল। সামনে তিনটে গদিঅলা চেয়ার। লোকজন এসে বসে। ওপাশে আমার বসার জন্য রিভলবিং চেয়ার। টেবিলের ওপর টেলিফোন, এসট্রে, কলমদানি, পিন কুশন কত কি।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি সিগারেট টানি। হঠাৎ চোখ পড়ে টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর আমার হাত রাখার জায়গায়, কাচের নিচে আমার ছবিটা। আমার বন্ধু আফজাল এক দুপুরে আমার মুখোমুখি বসে চা খেতে খেতে বলপয়েন্ট দিয়ে এঁকেছিল। এঁকে নিজেই যত্ন করে কাচের তলায় রেখে গিয়েছিল। ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হয় আমার। কেন যেন মনে হয় এই চেহারার লোকটাকে ঐ চেয়ারে একদম মানায় না। ওখানে তো অন্য কারও বসার কথা।

কথাটা ভেবে আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ি। গেস্টদের বসার চেয়ারে বসে সিগারেট খাওয়া ভুলে আমার চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে থাকি। তাই

তো, ঐ চেয়ারে আমাকে মানানোর কথা না। এতকাল কি করে কোন সাহসে আমি ঐ চেয়ারটায় বসে এসেছি। আমার দুঃসাহসে ভেতরে ভেতরে আমি নিজেই লজ্জা পাই। ওখানে তো অন্য কারও বসার কথা! আমি শালা জোর করে অন্য লোকের জায়গা দখল করে ছিলাম! ছিঃ! নিজের ওপর ঘেন্নায় গা জ্বলে যায় আমার। আমি শুয়োরের বাচ্চা, আস্ত একটা শুয়োরের বাচ্চা। এতকালের অপরাধ মোচনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে আমি প্যাড টেনে, কালো কলম নিয়ে গটগট করে রেজিগনেশান লেটার লিখি। টু দ্যা অথরিটি...

লেখা শেষ করে কাচের তলা থেকে কায়দা করে বের করি আফজালের আঁকা ছবিটা। বের করে কুটিকুটি ভাঁজ করে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিই। রেজিগনেশান লেটারটা ভাঁজ করে পেপার ওয়েট দিয়ে চেপে রেখে দিই বসের টেবিলে। তারপর বেরিয়ে আসি। পিয়নটা আবার আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। চলে যাচ্ছি দেখে বলে, আপনি কয়দিনের ছুটি নিছেন স্যার?

আমি আনমনে বলি, চিরকালের।

লোকটা কিছু বুঝতে পারে না। বলে, জ্বী!

না কিছু না। যাই।

আচ্ছা, স্লামালেকুম।

আমি সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে নামতে মনে মনে বলি, পিয়ন ভাই, তোমার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না।

নিচে নেমে আমার হঠাৎ করে মনে পড়ে পকেট তো সদরঘাট হয়ে আছে। আজ বিশ তারিখ, এ কদিনের মাইনেটা নিয়ে নিলে হয় না। এটা তো আমার পাওনা।

কথাটা মনে হতেই সরাসরি চলে আসি একাউন্টস সেকশানে। একাউন্টেন্ট ভদ্রলোক সবে লাঞ্চ সেরে, একটা ব্রিস্টল সিগারেট ধরিয়ে ক্যাশে বসেছেন। আমি গিয়ে তার সামনে ডান হাতটা মেলে ধরি। গোলাম সাহেব, কিছু টাকা দিন তো?

গোলাম সাহেব থতমত খেয়ে বলেন, কত স্যার?

হাজার খানেক! তার আগে মনে মনে হিসেব করে নিয়েছি বিশদিনে আমার মাইনে এরকমই। একটি পয়সাও বেশি নিচ্ছি না। গোলাম সাহেব আমতা আমতা করে বললেন, ক্যাশ শর্ট আছে স্যার। শ'পাঁচেক হলে চলে?

আমি দুসেকেন্ড ভেবে বলি, দিন।

তারপর মনে মনে একটা কথা ভেবে খুব পুলকিত হই। বাকি পাঁচশো টাকা আমি কখনও নিতে আসব না, ওটা এই কোম্পানিকে দিয়ে গেলাম। এতকাল ঐ চেয়ারে বসে আমি যে অপরাধ করেছি তার জরিমানা। টাকাটা পকেটে পুরে, ভাউচারে দ্রুত একটা সিগনেচার করে বেরিয়ে আসি। কিন্তু কোথায় যাব?

তখন মনে পড়ে সিরাজের কথা। চিটাগাংয়ের নদী কর্ণফুলি। সেই নদী পেরিয়ে ওপারে এক দ্বীপ। নাম শিকলবাহা। সেখানে আমার বন্ধু সিরাজ থাকে। আমি সিরাজের কাছে চলে যাব। আর কখনও এই শহরে ফিরব না। কোনও চেনা মানুষের সঙ্গে এই জীবনে আর দেখা করব না। এই শহর বড় নিষ্ঠুর অনাত্তরিক! মানুষরা বড় নির্দয়, অহংকারী। এখানে আমাকে মানায় না।

রাত দশটার ট্রেনে চেপে আমি চিটাগাং চলে আসি। রাতের ট্রেনে চড়ে বহুদূরের কোনও পথে আমি কখনও যাইনি। এই প্রথম। ইন্টারক্লাসের গাদাগাদি ভিড়ে চুপসে বসেছিলাম। সারারাত ট্রেন চলল, কতগুলো অচেনা স্টেশনে যে থামল আমি কিছুই খেয়াল করতে পারিনি। একবারও বাথরুমে যাইনি, একবারও উঠে দাঁড়াইনি। একটাও সিগারেট খাইনি। কী রকম একটা আচ্ছন্নতার ভেতর যে সময়টা কেটে গেল।

সকালবেলা চিটাগাং স্টেশনে ট্রেন থামলে হঠাৎ করে চমকে উঠি। চারদিকে লোকজনের গমগম। ফেরিঅলা, কুলিদের হৈ চৈ। লোকজন সব নেমে যাচ্ছে দেখে আমি যেন আচমকা গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠি। সারারাত এই ট্রেনে বসেছিলাম কিছুতেই মনে করতে পারি না।

আস্তেধীরে ট্রেন থেকে নামি।

বছর চারেক আগে একবার চিটাগাং এসেছিলাম। সিরাজের চাকরি তখন মাসখানেক হয়েছে। চিঠি লিখল, ভারি সুন্দর জায়গা দোস্ত। চলে আয়। গিয়েছিলাম। মনে আছে, স্টেশন থেকে নেমে রিকশায় দেড় টাকা ভাড়া, চাকতাই নামের এক জায়গা। সেখানে থেকে সাম্পানে বিশ মিনিট শিকলবাহা।

মনে পড়ে, স্টেশনে নেমে আমার সব কথা মনে পড়ে। গতকাল একদিনে তিনটে ঘটনা ঘটেছে। সকালবেলা রায়হান লিলি দুপুরে নদীর প্রেমিক এবং অফিসে আমার রেজিগনেশান। তারপর সম্পূর্ণ একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ট্রেনে। সারারাত একটাও সিগারেট খাইনি। সিগারেট খাইনি কথাটা মনে পড়তেই চনমন করে সিগারেটের তেষ্টা পায়। বুক

পকেটে আস্ত সিগারেটের প্যাকেট। ট্রেনে চড়ার আগে কিনেছিলাম। প্যাকেটটা বের করে অবহেলায় সেলোফিন ছিঁড়ি। তারপর একটা সিগারেট বের করে ধরাই। টানে-টানে মাথাটা হালকা হয়ে যায়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে মুরগি আর পরোটা খাই। কাল রাতে কিছু খাওয়া হয়নি। খেতে বসে টের পাই কী ভীষণ খিদে পেয়েছিল। আমার ঘন্টায় ঘন্টায় খিদে পায়। ছেলেবেলার অভ্যেস। অভ্যেসটা হয়েছিল নানীর কাছে থেকে। আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত গ্রামে নানীর কাছে থেকে পড়াশোনা করেছিলাম। মা বাবা আর সব ভাইবোন নিয়ে থাকত ঢাকায়। নানী যে কী আদর করত। কত রকমের খাবার যে বানিয়ে রাখত ঘরে! আমি ঘুরে ফিরে বার বার খেতাম, বার বার খেতাম। আর মিষ্টির প্রতি ছিল দারুণ লোভ। যখন তখন আধমাইল দূরের বাজারে চলে যেতাম। একটা বাধা মিষ্টির দোকান ছিল। যা ইচ্ছে, যত রকমের ইচ্ছে মিষ্টি খেয়ে আসতাম। বুড়ো ময়রা একটা লাল খেড়ো খাতায় টুকে রাখত। মাসকাবারি পয়সা দিত বাবা। আমি খেতাম মিষ্টি আর মিষ্টি গোপনে গোপনে খেত আমার দাঁত। আমার যদি সেই ছেলেবেলায় ফেরা যেত তাহলে আমি আর মিষ্টি খেতাম না। দাঁতগুলো সুন্দর করে রাখতাম। কিন্তু কার জন্য?

এ কথাটা ভাবতেই আবার নদীর কথা মনে পড়ে। নদীর কথা মনে পড়তেই বুকের ভেতরটা কুলকুল করে ওঠে। বয়ে যায় দুরন্ত এক নদী।

আমি একটা রিকশা নিই।

সাম্পানে উঠে অনেকক্ষণ বসে থেকেও কোনও যাত্রী পাওয়া যায় না। রোদ উঠে যায়। তিন টাকা ভাড়া ঠিক করে একাই সাম্পান নিয়ে ওপারে চলে আসি। কর্ণফুলির হা হা হাওয়ায় নদীকে টেলিপ্যাথিতে জানিয়ে দিই, প্রিয়তমা নদী, তোমার সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হবে না।

নদী ঠিক একথা জেনে যাবে।

ওপারে এসে দেখি জায়গাটা অনেক পাল্টে গেছে। চার বছর আগে যখন এসেছিলাম তখন সবে শুরু হয়েছে প্রজেক্ট। পাওয়ার স্টেশন হচ্ছিল। দিনরাত লোহালক্কড় ঠোকাঠুকি, শব্দ। ইলেকট্রিকের তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল চারদিকে। ইট পাথর বালি রড স্তূপাকার হয়ে ছিল। রাস্তাঘাট ছিল কাঁচা। দু একটা দোকানপাট ছিল, কন্ট্রাকটরদের থাকার জন্য ছিল অস্থায়ী ঘরদোর। লোকজন ছিল কম। এখন জায়গাটা বেশ জমজমাট হয়েছে। এই সকালবেলাই দেখছি চারদিকে অনেক লোকজন। দিনের কাজ শুরু হয়ে

গেছে। পাড়ে উঠে আমার মনে হয় জায়গাটা সম্পূর্ণ অচেনা। এখানে আমি কখনও আসিনি! এক জীবনে।

আস্তেধীরে হাঁটতে থাকি। একা একা হেঁটে যাই, অচেনা মানুষ। এখানে নতুন। তবুও ফিরেও কেউ আমার দিকে তাকায় না। জিনস পরা চুল দাড়িতে একাকার, অগোছাল। কেউ আমার দিকে তাকায় না। নদীর দেয়া হরিদাস পাল নামটা মনে পড়ে। হরিদাস পালের দিকে কেউ তাকায় না। সে চিরকালই একা, অবহেলিত।

আফজালের আঁকা ছবিটা আমি কাল অফিস থেকে বেরুনোর সময় কাচের তলা থেকে পিন দিয়ে টেনে বের করেছিলাম। বের করে ছিঁড়ে ফেলেছি। কোথাও আমি আমার কোনও চিহ্ন রাখব না।

সিরাজ থাকে হোস্টেল বিল্ডিংয়ে। বিল্ডিংয়ের পাশে ইট বিছানো পথ। তারপর খোলা মাঠে সোজা গিয়ে পড়েছে কর্ণফুলিতে। সেই মাঠে এখন মোষ চরছে। মাঠের মধ্য দিয়ে চলে গেছে ইলেকট্রিক পোস্ট। তারের ওপর রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছে অচেনা পাখি। নদীর জল চকচক করে জ্বলছে সকালের রোদে। তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। মৃদু একটা শব্দ পাওয়া যায়। আমি মুগ্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দৃশ্যটা দেখি। তারপর হঠাৎ করে চমকে উঠি। প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্য আমি দেখব কেন? আমি কে? নিজেকে গাল দিই, এই শালা হরিদাস পাল, তুই কী এত সুন্দর দৃশ্য দেখার যোগ্য!

পা চালিয়ে হোস্টেল বিল্ডিংয়ে ঢুকি।

লম্বা করিডোর পড়ে আছে। সিরাজ থাকে শেষ মাথায়। চার বছর আগে যে রুমে ছিল এখনও সেখানে। নির্জন করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার পায়ের শব্দ পাই। শব্দটা ভাল্লাগে না। কেন যে মনে হয় পৃথিবীতে শব্দ করে হাঁটার অধিকার আমার নেই। যতটা পারি শব্দ বাঁচিয়ে হাঁটি। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াই সিরাজের রুমের পাশে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। সিরাজ এখনও ঘুমুচ্ছে। বেলা অব্দি ঘুমুনোর অভ্যেস সিরাজের বরাবরই।

কিন্তু হাত তুলে দরজায় শব্দ করতে যাব, কেন যেন মনে হয় সিরাজ বুঝি আমায় ঠিকঠাক গ্রহণ করবে না। এতকালের বন্ধু হলে কি হবে, হরিদাস পালকে কী কেউ ঠিকঠাক গ্রহণ করে।

বুকের ভেতরটা টলমল করে। বহুকাল পর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। ইচ্ছে করে সিরাজের রুমের সামনে প্রণামের ভঙ্গিতে বসে হাউমাউ করে কাঁদি।

ঠিক তখুনি পাশে এসে দাঁড়ায় একজন। খালি গা, লুঙ্গি পরা। দাঁত ব্রাস করছে, কাঁধে তোয়ালে। দেখেই বোঝা যায় বাথরুমে যাচ্ছে। আমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, আপনি কার কাছে এসেছেন ভাই?

আমি থতমত খেয়ে বলি, সিরাজ। সিরাজুল ইসলাম। ইঞ্জিনিয়ার।

এই রুমই। দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক দুমদুম করে দরজায় কিল মারতে থাকেন।

খানিকপর ভেতর থেকে সিরাজের ঘুম জড়ানো ভারি গলা শোনা যায়, কে?

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বলেন, আপনার গেস্ট এসেছে স্যার।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাই, এই লোকের বস হচ্ছে আমাদের সিরাজ। গর্বে চৌত্রিশ ইঞ্চি বুক ছত্রিশ ইঞ্চি হয়ে যায়।

কিন্তু সিরাজ আমাকে কি ভাববে? কীভাবে গ্রহণ করবে? এইসব ভাবতে ভাবতে একসময় ইচ্ছে করে দৌড়ে পালাই। অচেনা কোনও জায়গায় চলে যাই। যেখানে আমায় কেউ চেনে না।

ঠিক তক্ষুণি দরজা খুললো সিরাজ। প্রিন্টেড লুঙ্গি আর সাদা শার্ট পরা। চোখে চশমা নেই। দুহাতে ছেলেমানুষের মতো চোখ ঢলছে।

আমাকে দেখে মুহূর্তে ঘুমটুম কেটে গেল সিরাজের। যেন স্বপ্ন দেখছে এমন গলায় বলল, তুই।

আমি সিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, এলাম।

আয়। বলে সিরাজ দুহাতে আমাকে ভেতরে টেনে নেয়। কী যে ভালবাসা ছিল সিরাজের হাতে। আমি কি এত ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য।

চোখে জল চলে আসে। আর ইচ্ছে করে পৃথিবীতে বহুকাল বেঁচে থাকি।

সিরাজের ঘরটা সেই চার বছর আগের মতোই আছে। একটা সিঙ্গেল খাট, একটা ওয়ার্ডরোব, এক সেট সোফা, ছোট্ট টেবিল। অফিসার্স কোয়ার্টার। এইসব আসবাবপত্র অফিসের। সিরাজ ব্যবহার করে। কিন্তু সিরাজ খুব অগোছালো। বিছানা বালিশ সব দলাই মলাই হয়ে আছে, ছোট্ট টেবিলের ওপর পড়ে আছে দুতিনটে পত্রিকা, সিগারেটের প্যাকেট ম্যাচ। এসট্রে ভর্তি ফিল্টার, ছাই।

দুতিনটা জামা প্যান্ট পড়ে আছে সোফার ওপর। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে ফুল স্পিডে। লাইট জ্বলছে। সিরাজ কি লাইট ফ্যান কখনও অফ করে! আমি সোফায় বসে সিগারেট ধরাই। সিরাজও।

সিগারেটে প্রথম টান দিয়েছি, সিরাজ বলল, তুই আসবি আমাকে জানালেই পারতি!

সময় ছিল না।

সিরাজ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী হয়েছে তোর?

আমি ম্লান হেসে বলি, কই কিছু না তো।

চেহারা টেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন?

ট্রেনজার্নি, বুঝতেই পারছিস।

দাড়ি কাটিস না কেন?

আমি গালে হাত বুলিয়ে বলি, কী হবে কেটে!

জামাকাপড় আনিসনি কেন?

মনে ছিল না।

কবি হয়ে গেছ নাকি শালা!

আমরা দুজনেই খুব হাসি।

এসময় ঘরদোর পরিষ্কার করতে একজন লোক আসে। বসে বসে কথা বলি। লোকটা নিপুণ হাতে লক্ষ্মী বউর মতো সবকিছু গোছগাছ করে। মুহূর্তে পাল্টে যায় ঘরের চেহারা।

লোকটা চলে যাবে, সিরাজ বলল, আব্দুল, বাবুর্চিকে বল দু জায়গায় নাস্তা পাঠাতে। গেস্ট আছে।

আর আজ থেকে আমার জন্য ডাবল খাবার।

আচ্ছা স্যার। লোকটা চলে যায়।

আব্দুল নামটা শুনে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। সিরাজকে বলি, সারা দুনিয়ায় সব চাকর বাকরের নামই কী আব্দুল হয় না কিরে? সিরাজ বলে, হ্যাঁ। সব জায়গায়ই! গল্প, উপন্যাসে, সিনেমায়, নাটকে! সব জায়গায় আব্দুলরাই চাকর।

কথাটা আমার খুব কানে বাজে। আব্দুলেরা সব জায়গায় চাকরের ভূমিকায়। আর হরিদাস পালরা? এরা কি? না নায়ক না চাকর! তাহলে?

মাথার ভেতরটা টলমল করে। হরিদাস পালের ভূমিকা কি?

অফিসে যাওয়ার সময় সিরাজ বলল, তুই ঘুমো। আজ অফিসে তেমন কাজ নেই। একটা সাইট দেখতে যাব। দেখেই ফিরে আসব। আমি তখন লুঙ্গি পরে, খালি গায়ে সোফায় বসে আছি। আরামসে সিগারেট টানছি। গোসল বাথরুম সব সেরে নিয়েছি। সিরাজ জোর করে সেভ করিয়েছে। ডাবল নাস্তা করে নিজেকে এখন বেশ ফ্রেশ লাগছে। চোখে ঘুম ঘুম ভাব।

সিরাজ চলে যাবে। বললাম, দোস্ত, তোর কাছে স্লিপিং পিলটিল নেই? মেলা। ওয়ার্ডরোবে আছে।

সিরাজ চলে যায়। আমি উঠে দরজা বন্ধ করি। তারপর ওয়ার্ডরোব খুলে অবাক হয়ে যাই। মাঝের তাকে মেলা বইপত্র রেখেছে সিরাজ। পাশে হরেক রকমের ট্যাবলেটের প্যাকেট। খুঁজে পেতে তিন রকমের স্লিপিং পিল পাই। সোনেরিল, টেন মিলিগ্রামের সিডাকসিন আর ভেলিয়াম ফাইভ। সিরাজের চিরকালই ঘুম কম। ইনসমনিয়ায় ভোগে। পিল না খেলে ঘুম হয় না সিরাজের। কিন্তু কেন? সুখী মানুষের ঘুম হবে না কেন? তাহলে সিরাজের কি কোনও গোপন দুঃখ আছে! কষ্ট! সিরাজ আমাকে কখনও বলেনি। ভীষণ চাপা স্বভাবের। আমিও তো কখনও জানতে চাইনি!

একটা সিডাকসিন খেয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুম ভেঙে আজ সিরাজকে ধরব। বল সিরাজ তোর দুঃখের কথা, গোপন কষ্টের কথা। তখুনি মনে হয়, শালা হরিদাস পাল, তোমার কী অধিকার আছে মানুষের গোপন কথা শোনার।

ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে যাই।

দুপুরবেলা সিরাজ অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে তোলে। ঘুমের ভেতর থেকে মনে হয় বহুদূর থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। আস্তেধীরে ডাকটা কাছাকাছি হয়। আমি চোখ মেলে তাকাই। সিরাজ বলল, ওঠ। খাবার রেডি।

আমার উঠতে ইচ্ছে করে না। সিডাকসিনের এ্যাকশান কাটেনি। আপনা আপনি চোখ বন্ধ হয়ে আসে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে শুই। আমি খাব না।

ওঠ। ফাজলামো করিস না। সিরাজ ধমকে ওঠে। খেয়ে ঘুমো। দুআঙুলে টেনে চোখের পাতা খুলি। তারপর হাত মুখ না ধুয়েই ডাইনিং হলে যাই। মাতালের মতো ঘুম চোখে কী কী যে সব খাই বুঝতে পারি না। দুতিন মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করে সিরাজকে ফেলেই রুমে চলে আসি। তারপর আবার বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে শুনি বহুদূরে কোথায় যেন ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। ছেলেবেলায় পাঠশালা ছুটি হয়ে গেলে এরকম ঘণ্টা বাজাত কেরামত দপ্তরি। মুহূর্তের জন্য কথাটা মনে পড়ে। কখন ঘুমিয়ে যাই বুঝতে পারি না। চোখের ভেতর যে এতো ঘুম লুকিয়ে ছিল কে জানত।

ঘুম ভেঙে দেখি ঘরের ভেতর একশ পাওয়ারের বালব জ্বলছে। তাকাতেই তীক্ষ্ণ আলো কামড়ে ধরে চোখ। একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলি। মনে হয় এই মাত্র জন্ম নিলাম। কাঁচা চোখে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখছি।

আস্তেধীরে আলোটা সয়ে এলে চোখ খুলি। শুয়ে থেকেই দেখি সোফায় বসে টেবিলের ওপর দুপা তুলে নিবিষ্ট হয়ে বই পড়ছে সিরাজ। খাট থেকে দুপায়ের ফাঁক দিয়ে সিরাজের মুখ দেখা যায়। বাঁ হাতে সিগারেট জ্বলছে।

আমি উঠে গিয়ে সিরাজের পাশে বসি। বুক কাঁপিয়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে আমার। সিরাজ মুখ তুলে তাকায়। আমি কোনও কথা বলি না। টেবিলের ওপর থেকে প্যাকেট নিয়ে একটা সিগারেট বের করি। তারপর ঠোঁট গুঁজে সিরাজের সিগারেটটার দিকে হাত বাড়াই। আগুনটা দে।

টেবিলের ওপর ম্যাচ ছিল। সিরাজ বলল, ঐ তো ম্যাচ।

ম্যাচ দিয়ে ধরাতে টায়ার্ড লাগে।

সিরাজ মৃদু হেসে সিগারেটটা দেয়। আমার কেন যে মনে হয় এই শেষবার সিরাজের হাত থেকে আগুন নিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছি। এ জীবনে আর কখনও এভাবে সিরাজের হাত থেকে আগুন নিয়ে সিগারেট ধরান হবে না।

সিরাজ বলল, খুব ঘুমুলি, না?

হ্যাঁ। বহুকাল এত ভাল ঘুম হয়নি।

কটা খেয়েছিলি?

একটা।

কি?

সিডাকসিন।

একটাতেই এত!

খুব টায়ার্ড ছিলাম বোধহয়।

সিরাজ হাতের বইটা মুড়ে রেখে বলে, কি হয়েছে এবার বল তো।

কোথায়?

এভাবে চলে এলি, চেহারা টেহারাও খারাপ। কিছু একটা সিওর ঘটিয়েছিস।

আরে না।

আমার কাছে লুকোচ্ছিস কেন?

এ কথায় আমি একটু চুপ করে থাকি। সিরাজকে কিছু একটা বলতেই হয়। কী বলব! গুছিয়ে বলার কি আছে? কোথেকে শুরু করব! নদীর কথা বললে সিরাজ হাসবে। বাড়িতে খাওয়া দাওয়া নিয়ে রাগারাগি করছি শুনলে ছেলেমানুষ বলবে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছি শুনলে বলবে বোকা। কিন্তু এইসব ব্যাপারের ভেতর কোথায় যে লুকিয়ে আছে বিশাল এক দুঃখবোধ সেটা সিরাজকে কী করে বোঝাব!

আমি কথা ঘুরিয়ে বলি, জিনিস টিনিস নেই দোস্ত?

আছে।

বের কর।

সিরাজ উঠে গিয়ে ওয়ার্ডরোবের নিচের ড্রয়ার থেকে আস্ত একটা জে এন্ড বি বের করে। স্কচ হুইস্কি দেখে বরাবরই আমি খুব খুশি হই। এই প্রথম আস্ত এক বোতল জে এন্ড বি দুজনে খাব ভেবে কিছুই মনে হয় না। একবার চকিতে কেবল মনে হয়, এই আমার শেষ মদ খাওয়া।

সিরাজ উঠে গিয়ে দুটো গ্লাস আনে। এক জগ পানি। তারপর নিজ হাতে বোতল খুলে দুটো গ্লাসে ঢালে। জল মেশায়। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

তিন পেগ খাওয়ার পর ডাইনিং রুমে। খেয়ে এসে সিরাজ বলল, আমি শুয়ে পড়ব দোস্ত, ভাল্লাগছে না। তুই খা।

আমি কোনও কথা বলি না। একটা সিগারেট ধরিয়ে গ্লাসে এক পেগ ঢেলে নিই।

সিরাজ বলল, লাইটটা অফ করে দে।

অন্ধকারে খাব কেমন করে?

জানালার পর্দাটা সরিয়ে দে, দেখবি ফাইন জ্যোৎস্না আসবে। একদম একশ' পাওয়ারের বাল্ব।

আমি উঠে গিয়ে জানালার পর্দা সরাই। তারপর অবাক হয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকি। বাইরে যে কী সুন্দর একটা দৃশ্য! সিরাজের জানালা থেকে দেখা যায় নীল উদাস একটা মাঠ। একেবারে কর্ণফুলিতে গিয়ে পড়েছে। নদীর ছোট ছোট ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে মাঠের কিনারে। নদীর ওপাশে ফুটে আছে বিশাল চাঁদ। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে মাঠ, নদী। এ সময় একাকী পাখি উড়ে যায়, জ্যোৎস্না নদীর ওপর দিয়ে কোথায় কোন দূরে যে যায় পাখি!

চরাচরে কোনও শব্দ ছিল না। অন্তরীক্ষব্যাপী ঝুলে ছিল বিশাল নির্জনতা। নির্জনে এ রকম কোনও সুন্দর দৃশ্যের সামনে আমি কখনও দাঁড়াইনি। নিজেকে বড় অপরাধী লাগে। আমি কী এই সুন্দর দৃশ্য দেখার যোগ্য!

জানালার পর্দা টেনে দিই।

সিরাজ বলল, কি হল?

ওসব জ্যোৎস্না ফোৎস্নায় হবে না। তুমি ঘুমো। আমি ঘন্টাখানেকের মধ্যে শেষ করব।

সিরাজ আর কথা বলে না। আলো থেকে মুখ ঘুরিয়ে শোয়।

আমি আবার গ্লাসে ঢালি। খেয়ে যাই।

বোতলটা অর্ধেকের বেশি শেষ করেছি, তখন মাথাটা কাটা ঘুড়ির মতো টাল খায়। একটু বমি বমি ভাব। চোখ টানছে। শুয়ে পড়া উচিত।

লাইট অফ করে বিছানায় গিয়ে শুই।

কিন্তু শুয়ে পড়ার পর অনেকক্ষণ কেটে যায়, ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করি। পাশে শুয়ে সিরাজ মৃদু নাক ডাকছে। সিরাজ এখন গভীর ঘুমে। আমার ঘুম আসে না কেন? দিনে ঘুমিয়েছি বলে!

বিছানা ছেড়ে উঠি। লাইট জ্বালাই। তারপর ওয়ার্ডরোবের সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

ওয়ার্ডরোব খুলে স্লিপিং পিলের প্যাকেটে হাত দিয়েছি ঠিক তখন বিছানায় সিরাজ পাশ ফিরে শোয়। সেই ফাঁকে আমি পাঁচ ছটা সোনেরিল মুখে পুরে দিই। তারপর জে এন্ড বির বোতলটা উপুড় করে ধরি মুখে। নীট পুরোটা পানির মতো ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিই। তারপর টলতে টলতে দরজা খুলে বেরিয়ে যাই। কখন কোন ফাঁকে যে উদাস মাঠটায় এসে পড়ি বুঝতে পারি না। টলতে টলতে মাঠ ভেঙে নদীর দিকে হেঁটে যাই।

চাঁদ তখন নদীর ঠিক মাঝখানে উঠে এসেছে। জ্যোৎস্নায় নদীর জল গেছে রূপোলী হয়ে। মাঠের ঘাসে জ্যোৎস্না পড়ে গাঢ় হয়ে গেছে। রূপোলী ঢেউ এসে মৃদু শব্দে ছুঁয়ে যাচ্ছিল মাঠের ঘাস। আমি জ্যোৎস্না ভেঙে নদীর দিকে হেঁটে যাই।

নদীর একেবারে কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসি। দুহাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে তুলে কে জানে কার উদ্দেশ্যে ফিস ফিস করে বলি, শুদ্ধ কর। আমাকে শুদ্ধ কর।

নদীর জল ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমার ধুয়ে দেয়। দূরে বহুদূরে তখন পাঠশালায় ছুটি হয়ে যাওয়ার ঘন্টাধ্বনি ওঠছিল। কেরামত দপ্তরি ঘন্টা বাজায়। ঢঙ ঢঙ।

আমি আস্তেধীরে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ি।

Pathfinder